সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ
প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৬

প্রকাশক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা ৩৭

সাহিত্য- ..রিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৫ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৭৫ ॥ সংখ্যা ১

বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল

বিমানবিহারী মজুমদার

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যদেশে যে কয়েকজন মনীষী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার(১) সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন আলোচনা হয় নাই। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যর চার্লস্ উইল্‌কিন্স সর্বপ্রথমে ইংরেজী ভাষায় গীতার অনুবাদ ও আলোচনা প্রকাশ করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁহার অনুবাদে অনেক ভুল ত্রুটি ছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Chevalier d' Obsonville গীতার সহিত ফরাসী পাঠক-দিগকে পরিচিত করেন। কিন্তু ১৮২৫ ও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে Humboldt বার্লিনের বিজ্ঞান আকাদেমীতে গীতা সম্বন্ধে যে দুইটি বক্তৃতা করিয়া জার্মান পণ্ডিতগণের দৃষ্টি গীতার সুমহৎ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেন তাহাকেই গীতার ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুধ্যমান দুই সেনাদলের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত দার্শনিক কথোপকথনে অর্জুনের পক্ষে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র Humboldt-এর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে তিনিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে C. Lassen পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া মহাভারত ও গীতার বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহার মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে Cockburn Thomson যে গীতার আলোচনা প্রকাশ করেন তাহা যে কত ভ্রান্তিপূর্ণ সে কথা দেড় পংক্তির একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উহার পাঁচটি ভুল উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃঃ ১০ পাদটীকা, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)।

---

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শুধু গীতা বলিয়া উল্লেখ করিব। কিন্তু ইহা ছাড়া মহাভারতেই আরও ১৫ খানি গীতার বিবরণ লিখিত আছে। ভীষ্ম বা ষষ্ঠ পর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ বা শান্তিপর্বে উতথ্য গীতা, বামদেব গীতা, ঋষভ গীতা, ষড়জ গীতা, সম্পাক গীতা, মঙ্কি গীতা, বোধ্য গীতা, বিচক্ষু গীতা, হারীত গীতা, বৃত্র গীতা, পরাশর গীতা ও হংস গীতা আছে। অনুশাসন পর্বে ব্রহ্ম গীতা ও অশ্বমেধ পর্বে অনু গীতা ও ব্রাহ্মণ গীতা আছে। লোকমান্য টিলক মহোদয় এগুলি ছাড়া পুরাণাদিতে প্রদত্ত আরও অনেকগুলি গীতার উল্লেখ করিয়াছেন (গীতা রহস্য, পৃঃ ২-৬)। এই সকল গীতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরে মহাভারতাদিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে Weber বলেন যে বিভিন্ন ও বিপরীত অর্থদ্যোতক কয়েকটি অংশ জোড়াতালি দিয়া গীতাগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই মত বঙ্কিমের পরে Holtzmann ১৮৯২-৯৫, Hopkins, ১৮৯৫, এবং R. Garbe ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করেন—যদিও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়ে মিল খুব কম। 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র Webar-এর অনেক মত খণ্ডন করিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত F. Lorinser দেখাইতে চেষ্টা করেন যে নিউ টেস্টামেন্টের দ্বারা গীতা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। তাঁহার লেখার অনুবাদ Indian Antiquaryর দ্বিতীয় বর্ষে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরের বৎসর রামকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ঐ মতের প্রতিবাদ ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন (পৃঃ ১৪)। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং বহু প্রমাণসহকারে Lorinser-এর মত খণ্ডন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মহারাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ তিনি তাঁহার সম্পাদিত গীতায় রাখিয়া গিয়াছেন। তেলাং-এর গ্রন্থ প্রকাশের বৎসরেই John Davies বহু পাদটীকা সমন্বিত গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়া—সিদ্ধান্ত করেন যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে ভগবদ্গীতার উৎপত্তি ধরা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহার মতও অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। এই সব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গীতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদ আলোচনা করিতে হইবে। তাঁহার পরলোকগমনের পরে যে সব আলোচনা হইয়াছে তাহার আলোকেও তাঁহার বিচারধারার নিরীক্ষা প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতন সুবৃহৎ গ্রন্থে গীতা সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লেখেন নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই নীরবতার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন যে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' (১৮৮৮ খ্রীঃ) গীতোক্ত ধর্ম কিছু কিছু বুঝাইয়াছেন এবং "পরে আর একখানি লিখিতে" নিযুক্ত আছেন। উহা তাঁহার সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত। উহার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা তিনি লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

'ধর্মতত্ত্বে' তিনি গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে সরাসরি কোন মন্তব্য করেন নাই। উহার 'খ' ক্রোড়পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্যপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়"। 'ধর্মতত্ত্বে'র সপ্তদশ অধ্যায়ে গীতার ৯।৩২ শ্লোকের ব্যাখ্যার সময় পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক ও পাপযোনির ভক্তিধর্মে অধিকারের সাম্য বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"কৃতবিদ্যগণের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন

হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না?" ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে প্রাক্-বুদ্ধ যুগের গ্রন্থ মনে করিতেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার' পত্রিকায় তিনি গীতার ২।১৬ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিতে গিয়া তিনি বলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ সময়ে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্যই ঐরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। যখন দুইপক্ষের সেনা পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত তখন যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম শ্রবণ করিবেন, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবপর মনে করেন নাই। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎ-প্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা। আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্য লেখার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, কেননা তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন যে পাঠ প্রচলিত আছে, তাহার ঐক্য আছে। এই কথা বলিয়াই তিনি গীতার রচনাকালের নিম্নতম সীমা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত করিয়াছেন—"কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অন্যূন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল।" শঙ্করাচার্যের জন্ম ৬০৮ শকাব্দ বা ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া বঙ্কিমের সমসাময়িকদের ধারণা ছিল। তাহার হাজার বছর আগে হইলে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর চেয়ে পরে গীতার রচনা হইতে পারে না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের Vaishnavism Saivism and Minor Religious Systems গ্রন্থে ঠিক এই সিদ্ধান্তই লিখিত হইয়াছে—It was composed not later than the beginning of the fourth century before the Christian era. How much earlier it is difficult to say." ভাণ্ডারকর মহোদয় খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ রচনার ২৬।২৭ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মত ব্যক্ত করেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মতে দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 'প্রচারে' গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক অবধি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তারপর কোন সময়ে ৩।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লেখেন—"গীতা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার জন্য Huxley বা Tyndale ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।" তিন হাজার বছর পূর্বে গীতা রচিত হইয়াছিল বলিলে বুঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে না হইলেও, ঐ যুদ্ধের কিছুকাল পরেই গীতা রচিত হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণের (৪।২৪।৩২) উক্তি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে(২) রাজত্ব করেন ও তাঁহার পূর্বে ১১১৫

(২) বঙ্কিমচন্দ্র অসাবধানতাপ্রযুক্ত লিখিয়াছেন—"আলেকজন্দর ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রিঃ অব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন।" উহা খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইবে।

বৎসর ধরিয়া অন্যান্য রাজারা পরীক্ষিতের জন্মকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ধরিয়া খ্রীষ্টের পূর্বে ১৪৩০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল বলেন। জ্যোতিষিক প্রমাণের দ্বারাও তিনি উহার সমর্থন করেন ও লেখেন—"ভরসা করি এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।"

কিন্তু এখনও অনেকে মনে করেন যে গীতা পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা হইয়াছিল। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 'উদ্বোধন কার্যালয়' হইতে প্রকাশিত গীতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই রূপে মিঃ বৈদ্য এবং অধ্যাপক ভি. বি. আঠাওয়ালে বহু অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, গীতা খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্বে রচিত"(৩)। কিন্তু সি. ভি. বৈদ্য মহাশয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণকল্পতরুতে গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে তিন রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন(৪)। তাঁহার তৃতীয় মত বঙ্কিমচন্দ্রের মতের অনুরূপ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' (১।১১ অঃ) বলেন যে মহাভারতের তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে পাণ্ডবদের-জীবনবৃত্ত ও আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছু নাই—ইহাই ২৪ হাজার শ্লোকের ভারত সংহিতা। দ্বিতীয় স্তরে পারমার্থিক দার্শনিকতত্ত্ব পরিপূর্ণ, অনুদার, এবং কবিত্বাংশে হীন। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া রচিত হইয়াছে, যে যখন কিছু রচনা করিয়া মনে করিয়াছে "বেশ রচিয়াছি" সে তাহাই মহাভারতে জুড়িয়া দিয়াছে। তিনি গীতাকে এই তৃতীয় স্তরের মধ্যে ধরিয়া লিখিয়াছেন —"শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনিক পর্ব্বের অধিকাংশ ভীষ্মপর্ব্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্ব্বের প্রজাদের পর্ব্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়।" ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লাসেন মহাভারতের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর নির্দেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লাসেনের মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি গীতার ২।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না' শব্দটির অর্থ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্

তিনি পরবর্তী বাক্যে উহা সংশোধন করিয়াছেন। অতএব ঐ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরি-লিখিত ১১১৫ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ১৪৩০ খ্রীঃপূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

(৩) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—গীতা (ষষ্ঠ সং ১৩৬০) পৃ. ২২।

(৪) কল্যাণকল্পতরু (১৯৩৫ জানুয়ারি), পৃ. ১৩৫ "We may roughly say that the date of the original Gita is somewhere about 3100 B. C. কিন্তু ১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "If we take the date of Panini to be about 800 B. C.,···We may take the Gita to about 1200 B. C. or at least to 1000 B. C. where we further remember that Sri Krisna indentifies Himself with Margasirsa as being the first of months, as in other things, we can take the Gita still further back, i. e., obout 1400 B. C., before the latest possible date for Vedanga Jyotisa."

ডেভিস কিভাবে করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন—"ডেভিস একজন ক্ষুদ্র প্রাণী...তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের -খোদ লাসেনের।" কৃষ্ণচরিত্রের ৫।৭ অধ্যায়ে তিনি পুনরায় বলিয়াছেন গীতা "প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক"। গীতার ২।৩৪ হইতে ৩৭ শ্লোককে তিনি শুধু প্রক্ষিপ্ত বলেন নাই, "এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য" বলিয়াছেন (গীতা পৃ. ৬৯, সাহিত্য-পরিষৎ সং)। তারপর এমন একটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তিনি বলেন—"যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" পূর্বেই দেখাইয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' লিখিয়াছেন যে শঙ্করাচার্যের পর গীতায় আর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ঢুকে নাই। এখন কি তাহার উল্টা কথা বলিতেছেন? শঙ্করাচার্য ঐ শ্লোক কয়টির ভাষ্য করিয়াছেন, সুতরাং তিনি উহাদিগকে প্রক্ষিপ্ত বা গীতাকারের অযোগ্য মনে করেন নাই। খুব সম্ভব "শঙ্করের পূর্বে" লিখিতে "শঙ্করের পরে" হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতির ভাষ্য ও টীকা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ড'সেন, হিল, রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতির বহুপূর্বে তিনি দেখান যে কঠোপনিষদের দুইটি শ্লোক গীতার ২।১৯ ও ২০ শ্লোকরূপে গৃহীত হইয়াছে। তিনি ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—"শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই মত"। (গীতা, পৃ. ৬৩)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে উপনিষদের পরবর্তী অথচ বুদ্ধের পূর্ববর্তী স্থির করিয়াছেন। বুদ্ধের পূর্বে গীতা রচিত হইয়াছে বলার বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। প্রথমতঃ গীতায় (৬।১৫) নির্বাণ শব্দ আছে। কিন্তু নির্বাণ অর্থে বৌদ্ধদর্শনের অভিপ্রেত নির্বাণের কথা এখানে বলা হয় নাই। রামানুজাচার্যের মতে নির্বাণকাষ্ঠারূপাং অর্থাৎ সুখের পরাকাষ্ঠারূপ মৎসংস্থা বা আমাতে সম্যক্ রূপ অবস্থিতির জন্য শান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ গীতায় (১৫।১৫) বেদান্ত শব্দের উল্লেখ আছে। যদি উহা বেদান্তসূত্র হয় তাহা হইলে গীতাকে বুদ্ধ-পরবর্তী বলিতে হয়। কিন্তু বেদান্ত মানে বেদান্তসূত্র নহে। রামানুজাচার্য উহার অর্থ করিয়াছেন 'বেদের বাক্যের যেটি চরম ফল বা অন্ত্যফল তাহার নাম বেদান্ত'। তাছাড়া মুণ্ডক (৩।২।৬) ও শ্বেতাশ্বতর (৬।২২) উপনিষদেও বেদান্ত শব্দ আছে। তৃতীয় যুক্তি হইতেছে যে গীতায় (১৩।৪) 'ব্রহ্মসূত্র' শব্দটি পাওয়া যাইতেছে। এখানে ব্রহ্মসূত্র বলিতে যদি বেদান্তসূত্র বুঝায় তাহা হইলে গীতাকে প্রাক্-বৌদ্ধ রচনা বলা যায় না। কেননা ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় প্রকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের

১৮ হইতে ৩২ সূত্রে বৌদ্ধ দর্শনের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর কিন্তু ব্রহ্মসূত্র বলিতে গ্রন্থ না বুঝাইয়া 'ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি' মানে করিয়াছেন। রামানুজাচার্য কিন্তু এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "ব্রহ্মপ্রতিপাদন—সূত্রাখ্যৈঃ পদৈঃ শারীরকসূত্রৈঃ"। শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত আনন্দগিরি তাঁহার সম্প্রদায়ের আচার্যের ব্যাখ্যার পরিবর্তে রামানুজের ব্যাখ্যাই মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মসূত্র মানে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সূত্রযুক্ত গ্রন্থ।

শ্রীধরস্বামী এই মতকে বিকল্প 'যদ্বা' বলিয়া মানিয়াছেন; কিন্তু প্রথমে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসূত্র বলিতে "যতো বা ইমানি ভূতানি যায়ন্তে" ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্য বুঝায়। মধুসূদন সরস্বতীও শ্রীধরের প্রথম ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং প্রাচ্য টীকাকারদের মধ্যে শঙ্কর ও মধুসূদন একপক্ষে; রামানুজ ও আনন্দগিরি অন্যপক্ষে এবং শ্রীধর নিরপেক্ষ। সুতরাং কোন পক্ষই ভোটে জিতিলেন না। কিন্তু Weber, যিনি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহকে যতটা সম্ভব অপ্রাচীন প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর, তিনি বলেন যে এখানে 'ব্রহ্মসূত্র' শব্দটি "may be taken as an appellative rather than as a proper name"(৫)। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে W. Douglas, P. Hill উক্ত মত ও মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মসূত্র বলিতে উপনিষদের বাক্যই বুঝায়, কেননা ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ গীতার পরে রচিত হয়।

কিন্তু গীতার কাল নির্ণয়ের বেলায় তিনি লিখিয়া বসিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গীতা বর্তমান আকার গ্রহণ করে (৬)। তিনি যুক্তিকারণ বিশেষ কিছুই দেখাইলেন না; শুধু বলিলেন যে গীতার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য নাকি ঐ তারিখ সমর্থন করে; কেননা গীতাতে নাকি কৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব সকলে মানেন নাই। একজন ভারতীয় ঐতিহাসিকপ্রবরও লিখিয়াছেন যে গীতায় যখন পাওয়া যাইতেছে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" (৭।১৯) তখন নিশ্চয়ই খুব অল্প লোক কৃষ্ণকে মানিতেন। তাঁহার যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে এখনও তো বাসুদেবকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করেন এমন লোক সুদুর্লভ; সুতরাং গীতা বিংশ শতাব্দীতে রচিত হওয়াও সম্ভব।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের আর একটি প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে গীতা পরস্পর-বিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ—নানান যুগের নানান মতবাদ জোড়াতালি লাগাইয়া বইখানি সঙ্কলন করা হইয়াছে। তাই এক একজন পণ্ডিত গীতার প্রথম রচনা ও বর্তমান আকারে পরিণতির বিভিন্ন সময় নির্দেশ করিয়াছেন। কালানুযায়ী সাজাইয়া ইঁহাদের মত নিচে দেখাইতেছি।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে Lassen স্থির করেন—গীতা ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হইয়াছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে Lorinser বলেন যে New Testament লেখার প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে গীতা রচিত হয়। ১৮৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে Holzmann বলেন যে গীতা

(৫) Weber —*History of Sanskrit Literature.* p. 242 F. N.

(৬) Hill—*The Bhagavadgita* (Oxford University Press, 1928), p. 18

প্রথমে ছিল Pantheistic বা বৈদান্তিক কাব্য, পরে ইহা বৈষ্ণবভাবে ঢালিয়া সাজা হয়। তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে Garbe বলেন যে গীতার মধ্যে পরস্পরবিরোধী উক্তি প্রচুর; কোন সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা না করিয়া Theism ও Pantheism উভয়ই প্রচার করা হইয়াছে। আমাদের দেশের যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে সেখানে Hopkins সাহেবের সিদ্ধান্তের খুব কদর। কিন্তু প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকিলেও গীতার উপর ইঁহার শ্রদ্ধা প্রায় অনুপস্থিত। তাই তিনি সুতীব্র ব্যঙ্গ করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন যে গীতা শুনিয়া সঞ্জয়ের সত্যই মনে হইয়াছিল যে ইহা অদ্ভুত এবং পরস্পরবিরোধী উক্তির প্রাচুর্য দেখিয়া তাঁহার রোমহর্ষণ হইবারই কথা (১৮।৭৪-৭৬)—"The same thing is said over and over again, and contradictions in phraseology and in meaning are as numerous as the repititions, so that one is not surprised to find it described as 'the wonderful song, which causes the hair to stand on end.' The different meanings given to the same words are indicative of its patchwork origin, which again world help to explain its philosophical inconsistencies (৭)।" তাঁহার মতে গীতা ছিল শুরুতে অসাম্প্রদায়িক ও শেষযুগের উপনিষদ্, পরে উহা বৈষ্ণবীয় ভাবে সাজানো হয় এবং তারপর কৃষ্ণের মহিমা ঘোষণার জন্য পুনর্লিখিত হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপণ্ডিত মিশনারী ফার্কুহার সাহেব *The Age and Origin of the Gita* পুস্তিকায় বলেন যে গীতা সেই যুগে লেখা হয় যখন ধর্মশাস্ত্র এবং অথর্ব্বন উপনিষদগুলি রচিত হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন যে ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরে কৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টীয় যুগ আরম্ভের পরে লিখিত হয়(৮)। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে Barnett সাহেব লেখেন যে গীতা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বই কিন্তু ইহার লেখকের মনে বিভিন্ন ধারার ঐতিহ্য গোল পাকাইয়া গিয়াছিল, 'the different streams of tradition became confused in the mind of the author'। ইংরেজী উদ্ধৃত না করিলে বিশ্বাস করা কঠিন যে এমন অশ্রদ্ধার সহিত কেহ গীতার সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে পারেন। বার্নেটের গীতা প্রকাশের বছরেই জার্মান পণ্ডিত R. Garbe স্পর্ধা সহকারে লেখেন যে তিনি গীতার কোন্ অংশ কোন্ যুগে লেখা হইয়াছিল তাহা নির্দেশ করিতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে যথার্থই বলিয়াছেন যে এমন ধরনের কথার উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। গার্বে বলেন, গীতা প্রথমে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা হয়, কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান আকার ধারণ করে(৯)।

(৭) **Hopkins—The *Religions of India*, p 400.**

(৮) **Farquhar—*Religions of India*, p. 398**

(৯) ***Encyclopaedia of Religion and Ethics*, v. II, p. 538.**

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে Jacobi বলেন যে গীতার মৌলিক অংশ তো দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকের সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। ইহার পর সাংখ্য, যোগ, ব্যবসায়, সমাধি প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে সব প্রক্ষিপ্ত(১০)। প্রক্ষিপ্তবাদের চরম উক্তি করিয়াছেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত Rudolf Otto। ইনি Richard Garbe-এর "স্মরণার্থম্" তাঁহার *"The Original Gita"* গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে গীতার প্রথম অধ্যায়ের ৪৭টি শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪টি (১-১৩ ; ২০, ২২, ২৯-৭৭), দশম অধ্যায়ের ৮টি, একাদশ অধ্যায়ের ৪২টি (১-৬, ৮-১২, ১৪, ১৭, ১৯-৩৬, ৪১-৫১) এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭টি একত্রে ১২৮টি শ্লোক মূল গীতায় ছিল, কেননা ঐ কয়টিই অর্জুনের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিধার সহিত সম্পর্কিত ; বাকী ৫৭২টি শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। আসামের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর পরম বৈষ্ণব সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যুদ্ধসম্পর্কিত শ্লোকগুলি সংযোজন করিয়া মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে(১১)।

হপ্‌কিন্স, গার্বে, হিল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের সমর্থনসূচক এক নূতন মতবাদ ছন্দশাস্ত্র ও ইতিহাসের আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন প্রচার করেন। তিনি বলেন যে অশোকের অহিংসা ধর্মের প্রতিক্রিয়ার যুগে, সুঙ্গরাজগণের সময়ে লোককে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবার উদ্দেশ্যে গীতার রচনা করা হয়। তিনি 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' শব্দের মধ্যে 'বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য ছাড়িয়া বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর' এই ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন(১২)। এই যুক্তির অভিনবত্বে মুগ্ধ হইলেও ইহার সত্যতা স্বীকার করার কয়েকটি আপত্তি আছে। সুঙ্গযুগেই পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয়। উহাতে 'জনার্দন স্তবাত্ম চতুর্থএব' বাক্যে জনার্দনের চতুর্ব্যূহের ইঙ্গিত আছে(১৩)। অথচ সমগ্র গীতার মধ্যে ব্যূহবাদের কোন কথা তো নাই-ই, এমন কি সঙ্কর্ষণের নাম পর্যন্ত নাই। ভাণ্ডারকর প্রথমে দেখান যে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঘোষুণ্ডি লিপিতে ও নানাঘাট লিপিতে সঙ্কর্ষণের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, গীতা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কিছু আগে লিখিত হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে গীতায় নারায়ণের নাম নাই, মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায় আছে, সুতরাং গীতা বর্তমান মহাভারতের পূর্ববর্তী।

বর্তমান মহাভারতে সভাপর্বের অন্তর্গত দিগ্বিজয় বর্ণনায় রোমা বিজয়ের কথাও আছে।

(১০) Z.D.M.G. Lxxii (1918) p. 323

(১১) S. C. Roy—*The Bhagavad Gita and Modern Scholarship* (Luzac & Co, 1941) pp. 244-263

(১২) প্রবোধচন্দ্র সেন—*ধর্মবিজয়ী অশোক*, পৃ. ৯০-৯৪ ; দেশ পত্রিকা ১৯৫৩, পূজা সংখ্যা, পৃ. ৫৫-৫৬।

(১৩) পতঞ্জলির মহাভাষ্য ৬।৩।৫ Surendranath Dasgupta—*History of Indian Philosophy*, ২য় খণ্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে ঐ মহাভাষ্যে ব্যূহরাজের কথা নাই।

সেই জন্য ঐ অংশকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা বলা হয়। পশ্চিমের পণ্ডিতরা বলেন যে মহাভারত রচনার পরে গীতা উহাতে সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। যদি তাহা হইত তাহা হইলে প্রথমতঃ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ব্যূহবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ ও গীতায় তাহার সম্পূর্ণ অনুল্লেখ থাকিত না। ভীষ্মপর্বে গীতাপর্বাধ্যায় শেষ হইবার ২০ অধ্যায় পরে ব্রহ্মা বলিতেছেন যে তিনি অনিরুদ্ধ হইতে, অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন হইতে এবং প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন (১৪)। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে শতবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উল্লেখ থাকিত না। শান্তিপর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে তিনবার, অশ্বমেধ পর্বের অনুগীতা পর্বাধ্যায়ে একবার ও আদিপর্বে তিনবার গীতার উল্লেখ আছে (১৫)। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে পূর্বপ্রচলিত গীতাই মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশ করা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও এই অর্থেই হয়তো তিনি ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন (পৃ. ৮১) "গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সাহেবদের অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে গীতায় কিছু জোড়াতালি আছে। তাই তিনি গীতার ৩।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে দশম হইতে ষোড়শ "এই সাতটি শ্লোক যে ভগবদুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি, এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। (পৃ. ১১৫) তাঁহার যুক্তি এই যে "কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে এই সাতটি শ্লোকের বিশেষ বিরোধ।" শঙ্করাচার্যের গীতা-ভাষ্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না"। (পৃ. ১১৯) তিনি 'যজ্ঞ' শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ৩।৯ শ্লোকে শঙ্করাচার্য যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর ধরিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ", "যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ" "যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ", "যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভব্" "যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না" যদি ধরা যায় যে নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ শ্লোকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে গীতা প্রণেতা রচনায় নিতান্ত অপটু নয়তো শঙ্কর ও শ্রীধরস্বামীর যজ্ঞ শব্দের অর্থ ভ্রান্ত। কিন্তু তাঁহার মতে "এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত একার্থেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে"। (পৃ. ২১) বঙ্কিমচন্দ্র গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকের পর আর ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

(১৪) মহাভারত ৬।৬১।৫৫-৬৬। (পুণা সং)

(১৫) ঐ ১২।৩৩৬।৩৬ ; ১২।৩৩৬।৪৮-৪৯ ; ১৪।১।

যদি পারিতেন তাহা হইলে দেখিতেন যে যজ্ঞ শব্দটি অন্ততঃ উনত্রিশবার গীতাতে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই(১৬)।

গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জোর গলায় একটা কথা বলিয়াছিলেন—"ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না, বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই"। (পৃ. ৯৬) ইংরেজ শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র, তিনি উহার দ্বারা ফরাসী, জার্মান, আমেরিকান প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের সকল পণ্ডিতকেই ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রাধাকৃষ্ণন্ ও বেলভেলকার অনেক অকাট্য প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে গীতার মধ্যে স্ববিরোধী কথা নাই। আপাত প্রতীয়মান বিরোধের ভিতর সুমহান সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ও The *Cultural Heritage of India* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "The Bhagavadgita, its synthetic character" নামক প্রবন্ধে ঐ সামঞ্জস্যই দেখাইয়াছেন।

লোকমান্য টিলক ১৯১০-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারে বসিয়া গীতারহস্য গ্রন্থ লেখেন ও বাহিরে আসিয়া মারাঠি ভাষায় উহা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শকাব্দপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পরে গীতার রচনাকাল কিছুতেই বলা যায় না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাণ্ডারকর ঐতিহাসিক সাহিত্যগত প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে সিদ্ধান্ত করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরে গীতা রচিত হইতে পারে না—ইহার কত পূর্বে উহা লিখিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলেন যে গীতা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর রচনা(১৭)। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্পষ্টতঃ কোন তারিখ উল্লেখ না করিলেও বলেন যে গীতার উপর বৌদ্ধপ্রভাবের বিন্দুমাত্র নিদর্শন নাই। এই সকল মতের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে তাঁহাদের বহু পূর্বেই এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন।

কিন্তু টিলক, রাধাকৃষ্ণন্, দাশগুপ্ত ও ঐতিহাসিক শিরোমণি ভাণ্ডারকরের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিতর্ক খণ্ডন না করিয়া ইতিহাসের সুবৃহৎ গ্রন্থের আধুনিক লেখকেরা বলিতেছেন যে গীতা খ্রীষ্টীয় যুগের কাছাকাছি, বড়জোর খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে(১৮)। ইঁহারা পশ্চিমের পণ্ডিতদের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই; ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব দেখাইলে পাছে তাঁহাদের কাছে উপহসিত হইতে হয় এই ভয়ে ইঁহারা সন্ত্রস্ত।

(১৬) গীতা ৩। ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫
৪। ২৩, ২৫, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩
৫। ২৯; ৮।২৮; ৯।১৬, ২০, ২৪; ১০।২৫; ১১।৪৮
১৬।১, ১৭।৭, ১২, ১৩, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭,
১৮।৩, ৫।

(১৭) Radhakrishnan—Bhagavadgita. p. 14.

(১৮) History and Culture of the Indian People, (ভারতীয় বিদ্যাভবন), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৪; ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪৯।
নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীও হিল সাহেবের দোহাই দিয়া ঐমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাংলা পুঁথি : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ

পঞ্চানন মণ্ডল

আধুনিক শিক্ষায় অভিমানপুষ্ট মুষ্টিমেয় লোকের চোখে বাঙ্গালাদেশের অনেক মানুষই 'অনুন্নত', 'অসংস্কৃত'; কিন্তু আসল বাঙালী-সমাজ তাঁদের সবাইকে নিয়েই। আজ ভাবতে অবাক লাগে এখনও পুরাতন বাংলা পুঁথির মালিক তাঁরাই। মালিক কিভাবে হলেন, সেই কথাটাই আগে বলি।

এদেশে ছাপাখানা বসবার আগে, বাঙালী ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা নিজেদের টোল-চৌপাড়িতে কম বেশী 'বিশাশয়' অর্থাৎ ১২০ বা ততোধিক পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনেই ব্যাপৃত থাকতেন সগৌরবে। পড়ুয়াগণও পাঠ পড়তে থাকতো আনন্দময় ঘরোয়া পরিবেশে। পাঠ্যক্রমে, পড়ুয়াদের খুঙ্গিতে থাকতো অমর, জুমর, মাঘ, নৈষধ, রঘু, পিঙ্গল, রামায়ণ ইত্যাদি শাস্ত্রের হাতে-লেখা পুঁথি। পক্ষান্তরে, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসাতে এবং সাধারণ ভদ্র মুসলমানদের বাড়িতে থাকতো কোরান, কালাম, কেচ্ছা, বয়েতের পুঁথি যস্‌খ্‌, নস্তালিক কিংবা শিকস্তা হস্তাক্ষরে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা। সেখানে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রায় শতাধিক গ্রন্থের (item) ব্যবস্থা বা syllabus প্রচলিত ছিল। কিন্তু, সেখানে গুরুমহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়, কঠিন কঠিন অঙ্ক 'প্রকাশ' করাতেই। অষ্টকোঠা, অষ্টশব্দী, অমরকোষাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলতো সেখানে 'সুখীরাম খাঁ'-এর মতো 'তিলি'র ছেলের কর্তৃত্বে। তিনি হামেশাই পড়ুয়াদের কাছে 'অস্থির' অঙ্ককে 'সুস্থির' করে দিতেন।—

অষ্টাদশ ছাওাল পড়িছে নিরন্তর　　অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর।
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে　　অষ্টকোঠা অষ্টপর সিক্ষা করে ইবে।
সরকার বেড়িয়া সভে বস্যে ডানিবাঁ　　অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ।
তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস　　কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাস।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয়　　অঙ্ক হল্যে অস্থির সুস্থির কর্য্যা লয়।

কিন্তু, সেখানেও অবলম্বন হাতে-লেখা পুঁথি।

বৈষ্ণবের আখড়ায় থাকতো চৈতন্যজীবনী ও পদাবলী, বাউলের আখড়ায় থাকতো মীন-গোর্খের হেঁয়ালী; মাঠেঘাটে ছিল শাক্ত পদাবলী; মঙ্গলকাব্যের মন্দিরা বাজত সমাজের সকল স্তরে; কাশীরাম-কৃত্তিবাস পূজিত হতেন ঘরে ঘরে। কোকশাস্ত্র, কবিরাজী

বা বৈদ্যকের পুঁথি, হেকিমি তিব্‌ তারও বহুল প্রচলন ছিল হাতে লিখে। ভাট, দৈবক, ঘটক মহাশয়দের বগলে ফিরত হাতে লেখা গ্রন্থ-কুলজী, পঞ্জী এই সবের। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে পুরাণ-পাঠ ও কথকতা হ'ত। তাও হ'ত হাতে-লেখা গ্রন্থ থেকে। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আচার-ব্যবহারের এই সকল সনাতন ধারা দেশের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'ত অব্যাহত ধারায় হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যস্থতায়।

এই সকল হাতে-লেখা পুঁথির নকল থেকে নকলে দেশের সর্বত্র ব্যাপ্তি ছিল। প্রথম যুগের ইংরেজেরাও এদেশে হাতে লেখা পুঁথিই কাজে লাগাতেন। তখন প্রত্যেক ভদ্রঘরেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধনার জন্যে পুঁথি রাখা ছিল অপরিহার্য। এই সকল পুঁথির আদর্শ থেকে নকল-করা ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান বৃত্তি। কারও কারও কাছে এ কাজ ছিল আবার নিছক বৃত্তির চেয়েও বড়ো। পারত্রিক কল্যাণ কামনায়, জন্ম-জন্মান্তরে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের আশায়, শোকতাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, সেকালের সমাজে বাংলা পুঁথির অনুলেখন করা হ'ত। কেউ কেউ আবার পুঁথি-লেখায় এতো অনাবিল সুখ পেতেন যে, মৃত্যুর পরে, তাঁর পুনর্জন্ম হলে, পুঁথি-লেখক হয়ে জন্ম নেবার আকাঙ্ক্ষাও তিনি প্রকাশ করে গেছেন। গ্রামের দরিদ্র চাষী থেকে রাজসিংহাসনের মহারানী পর্যন্ত পুঁথি লেখার কাজ গ্রহণ করতেন। আবার বেকার অবস্থায় পুঁথি লিখে সময় কাটিয়েছেন—এমন নজিরও রয়েছে। অথবা জলপথে ধান কিনতে গিয়ে নদীর ওপর নৌকায় বসে পুঁথি লেখাও হয়েছে। অর্থাৎ সেকালের জনজীবনে পুঁথিলেখা যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ ব্যাপার ছিল। হস্তাক্ষর ভালো হলে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ জাতিধর্মনির্বিশেষে পুঁথি লেখার পথ গ্রহণ ক'রে 'অবহেলে' 'পুঁথির অক্ষর' চালাতেন। অধোমুখে, স্তব্ধদৃষ্টিতে, পিড়াসিদ্ধ অর্থাৎ আসনসিদ্ধ হয়ে বসে বসে দিনের পর দিন পুঁথি নকল করতে করতে লিপিকরের পিঠ, কোমর, ঘাড় হয়তো বেঁকে যেত যন্ত্রণায়, কিন্তু তবুও বিরাম ঘটতো না অনুলেখনে।

শর, কঞ্চি, শকুনের পালক বা লোহার কলম দিয়ে বড়ো বড়ো এবং প্রায়শঃই পোক্ত-ছাঁদে, বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত কালিতে, সাধারণতঃ তুলোট কাগজের লম্বা ফালিতে বা তাল-পাতার ওপর এই সকল পুঁথি লেখা হ'ত প্রাচীনতর আদর্শ থেকে। পুঁথি লেখার জন্যে সেকালের কালি সে এক অদ্ভুত বস্তু। তার ছিল হরেক ফর্মুলা। তার একটা বলছি।—

লোধ, লাহা, লোহার গুড়ি, অর্কাঙ্গার, জবার কুঁড়ি
গাবের ফল, হরিতকি, ভৃঙ্গার্জুন, আমলকি।
বাবলা ছাল, ঝাঁটির রস, ডালিম সেচে করিবে কষ
ভেলায় কর্য্য এক থালি, চারি যুগ না উঠবে কালি।

আর তুলোট কাগজের ফালি তৈরী হ'ত বাঙ্গালাদেশের গাঁয়েই। কাগজ যাঁরা তৈরী করতেন, পদবী হত তাঁদের—'কাগজী'। এ-কথা বলে গেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে।

পুঁথির বিষয় অনুসারে পুঁথি লেখার আধারে স্বাতন্ত্র্য থাকত। সাধারণ কাব্য-সাহিত্যাদি লেখা হ'ত গ্রামে তৈরী খাঁটি তুলোট কাগজের উপর; বিশেষ পূজা-পদ্ধতির পুঁথি লেখা হ'ত তাল অথবা তেরেট পত্রে। তাগা-তাবিজ, মাদুলি দেওয়া হ'ত ভূর্জপত্রে লিখে। তেরেট পাতা, তুঁত, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের বাকল এবং পশুচর্মের উপর লেখা বাংলা পুঁথিও দুর্লভ নয়। অলঙ্করণের দিকেও পুঁথির লিপিকর বা পাঠকের দৃষ্টি কম ছিল না। হরিতাল, নির্মোক অভ্রাদি তুলোট কাগজে প্রলিপ্ত করা হ'ত পোকা-মাকড়ের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে। ছত্রের নীচে ও প্রত্যেক পৃষ্ঠার কিনারে চিত্র-বিচিত্র করা রয়েছে—তাও বহুস্থলে দেখা যায়। লিপিতে ভ্রম থাকলে, তা ছত্রসংখ্যা দিয়ে উপরে বা নীচে লিখে দেওয়া হ'ত। অক্ষর বা শব্দ কাটতে গিয়ে চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে এরকম পুঁথিও দেখা যায়। বিষয়-বস্তুর ওপর ছবি আঁকা বাংলা পুঁথিও পাওয়া যায়। পুঁথির মধ্যস্থলে ছোটো চৌকো ফাঁক রেখে তার কেন্দ্র-বিন্দুতে ছিদ্র করে, মোটা সুতো গলিয়ে, উপরে সাধারণতঃ কাঠের পাটা দিয়ে, পুঁথি সজোরে বাঁধতে হ'ত বায়ুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্যে। পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করবার এটা একটা পন্থা। বন্ধনে শিথিলতা পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। প্রবাদ আছে—'পুঁথিকে পুত্রের মতো পালবে আর শত্রুর মতো বাঁধবে।' পুঁথির মলাট হিসেবে প্রায়ই দেখা যায়, শাল-সেগুন কাঠের পাটা। চামড়ার খোলও করা হ'ত। তালপাতার বিনুনির ওপর তাল-বেতির সূক্ষ্ম কাজ তাও আছে। একই পুঁথিতে তালের বিনানো বাগড়া, চামড়া ও কাঠ সবই মলাট ও তার স্থায়িত্বের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, দেখা যায়। দেখেছি কাঠের পাটার ওপর নানা খোদাই নক্সা, চক্রাদি, চিত্রণাদি আধুনিক শিল্পাচার্যদেরও বিস্ময়ের বস্তু। মলাটের ওপরে পুঁথি জড়ানো হ'ত 'নামাবলী' কিংবা নতুন গামছা দিয়ে। মোটা খেরো কাপড় দিয়েও পুঁথি বাঁধা হ'ত।

এবার বলি, পুঁথির পুষ্পিকা-পদের কথা। পুঁথির পুষ্পিকাপদ বা Post Colophone Statement হচ্ছে গ্রন্থের মূল বিষয়ের বর্ণনার শেষে, মূল গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের পরিচায়ক, পুনরাবর্তিত সর্বশেষ ভণিতার পরে লেখা লিপিকরের আত্মকাহিনী মূল পদ। এই পুষ্পিকা-পদ বা লিপিকরের আত্মকাহিনীগুলি মহামূল্যবান উপকরণ সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক প্রত্যেকের নিকট। পুঁথি নকল করার নিমিত্ত কে কত দক্ষিণা পেলেন, অর্থাৎ কাপড়, গামছা, কৌড়ি বা তঙ্কা কে কত পেলেন, পুঁথির মালিক কে, পাঠক কে, তাঁর বিবরণ ও স্তুতিবাদ, কোথায় বসে পুঁথি নকল সমাপ্ত হ'ল, কখন সমাপ্ত হ'ল, তার সন তারিখ, বার, বেলা, তিথি-নক্ষত্র, প্রহর, দণ্ড, পল, কোন্ মুখে বসে পুঁথি লেখা হল, পরগনা, তৌজি, সাকিম, মোকাম, এগনে, ওসারার সমস্ত বিবরণ আমরা পাই গ্রন্থের শেষদিকে লিপিকরের এই সব 'পুষ্পিকা'-পদ বা অংশ থেকে। আবার লিপিকরের আত্মকাহিনী, ধর্মমত, সাধ-আহ্লাদ, খ্যাতি-অখ্যাতি, গৃহবিবাদ, মুদ্রাদোষ সবই এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এবং এই বিবরণ যে কোনো দিনলিপির চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়। গ্রন্থ নকল করায় এবং করানোতে পুণ্যবান ও

শ্রীমন্ত হওয়া, হরণ করায় রৌরব-নরক-প্রাপ্তি, হরণকারীকে তার মাতাপিতার শূকরী ও গর্দভ হবার, কিংবা সমাজ-বিগর্হিত অপকর্মে রত হবার, বা গো-ব্রাহ্মণ বধ করার অভিশাপ দেওয়া, নকলে ভুল থাকলে মুনির মতিভ্রম, ভীমের রণে ভঙ্গ, সরস্বতীর কথা বিচলিত হওয়া, হাতীর পা-টলা ইত্যাদির নজির দেখিয়ে, তার স্বাভাবিকত্ব প্রমাণ করার রীতিও চলিত ছিল। হিন্দু বা মুসলমানদের ব্যবহারের নিমিত্ত পারসিক অক্ষরে গ্রন্থ হিন্দু আচারে হিন্দুরাও নকল করে দিতেন। মুসলমানেরাও রামায়ণাদির গ্রন্থ নকল করেছেন,—'পুষ্পিকা'-পদ থেকে এই নজিরও দুর্লভ নয়। যাইহোক, ফল কথা হচ্ছে, সামাজিক ইতিহাসের টুকরা হিসাবে প্রত্যেকটি পুঁথির এই সকল প্রত্যাশিত পুষ্পিকা অংশের মূল্য অসাধারণ। ব্যক্তিগত সংবাদ ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে এর মধ্যে আবার সেকালের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি কৃষিকর্ম ও দৈবদুর্বিপাকাদির এমনসব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়, যার গুরুত্ব বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের পক্ষেও অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রসঙ্গতঃ দুটি পুষ্পিকা পদ উদ্ধার করে দিচ্ছি।—

প্রথম পুষ্পিকাটি ১২৩৫ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত একখানি পুঁথির শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে। পুঁথিখানির অনুলিপি হয়েছিল সেকালের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দাস চৌকির খণ্ডঘোষ পরগনার 'বোঁয়াই' গ্রামে। বসন্তচণ্ডীর পীঠস্থান-স্বরূপে বোঁয়াই গ্রাম সাম্প্রতিককালে সুপ্রসিদ্ধ। "সুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জন" নামে এই পুঁথিখানির লিপিকর হলেন কেনারাম দেবশর্মা, পাঠক সনাতন দে।

এই 'পুষ্পিকা'-অংশে ১২৩৫ বঙ্গাব্দে রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সংবাদ রয়েছে। অনাবৃষ্টির ফলে শুখা-বৎসরে চাষ-আবাদ হয়নি। ফলে লিপিকর বেকার অবস্থায় পুঁথি লিখে দিন গুজরান করেছিলেন। চালের দর বেড়ে গিয়েছিল ; এমন কি, জোটেনি। গ্রামের চাষীরা পেটের জ্বালায় স্বগ্রাম ছেড়ে বর্ধিষ্ণু গ্রামান্তরে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়েও অপরিচিত জনপ্রবাহের কর্মসংস্থান হয়নি।

পক্ষান্তরে গ্রাম-সমাজের নৈতিকমান তখন অনেক নেমে গিয়েছিল। ধর্মকর্মে লোকের আস্থা ছিল না ; দরিদ্র মণ্ডল-মুখ্যগণ ধনীর মোসাহেবে পরিণত হয়েছিলেন। উপরন্তু, ছিল কর-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদারী তহশীলদারের উৎপীড়ন।

অতঃপর, দ্বিতীয় পুষ্পিকাটি হল, বাঙ্গালাদেশের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের একখানি প্রামাণিক দলিল। লিপিকর নন্দদুলাল দেবশর্মা ১১৭৭ সালের ২৭-এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বগ্রাম খণ্ডঘোষে বসে কবিকঙ্কণের এই 'মঙ্গলচণ্ডী'র পুঁথির অনুলিপি করেছিলেন। ১১৭৭ সালে অনুলিপি করলেও, ১১৭৬ সালের মহা-মন্বন্তরের বীভৎস স্মৃতি তাঁর মনে তখনও প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে।

১১৭৬ সালে অনাবৃষ্টির ফলে শস্য জন্মায় নি। ভোগ্যপণ্যের দর লোকের ক্রয়-ক্ষমতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এছাড়া তরিতরকারী অর্থাৎ সবজী জন্মায়নি। দরিদ্রের আহার কোনোপ্রকার শাকও ছিল না ; কিছুই ছিল না।

১১৭৭ সালে যে-সকল গ্রামবৃদ্ধের বয়স সত্তর বৎসরেরও উপরে, তাঁরা বলছেন,—এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো কোনো মন্বন্তরের কথা তাঁরা আগে কখনও শোনেন নি! ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বহু লোক মারা গেল, অবস্থাপন্ন চাষীর ঘরেও চালের অভাবে হাঁড়ি চাপেনি।

লিপিকর বলেন, ১১৭৬ সালে অনাবৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু, ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। লিপিকরের মতে, ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত মহাপ্রলয় হওয়া সত্ত্বেও লোকে এই বৎসর টিকে রইল; এর জেরস্বরূপে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী বৎসরে কি হবে, কে জানে!

এ ছাড়া, এই অংশের মুখবন্ধে রয়েছে, গ্রন্থের বিরুদ্ধ-সমালোচকদের প্রতি তীব্র কষাঘাতের আপ্তবচন।—পুস্তক পড়তে দেবে সুবুদ্ধি ব্যক্তিকে; স্থূলবুদ্ধিকে নয়। কারণ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি গ্রন্থখানিকে গোবর মাখতে অর্থাৎ মসীলিপ্ত করতে পারে।

লিপিকরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে 'বাটী' ও 'বাড়ি' প্রসঙ্গে। এতে স্পষ্টতঃই দেখা যায়, সেকালের লেখকদের বাংলা রচনায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ-প্রয়োগ পরিত্যাগ ক'রে, অপভ্রংশ বা ভাষা-শৈলীর প্রতি সজ্ঞান অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ-প্রচেষ্টা।

মূল পুষ্পিকা দু'টি এই,—

(১) ইতি সুদামার দারিদ্রভঞ্জন সমাপ্ত পুস্তক শ্রীকেনারাম দেব[শ]ন্মার পাঠক শ্রীসনাতন দে সাং বোঙাঞি পরগণে খণ্ডঘোস চৌকি ইন্দাস জেলা বর্দ্ধমান। ইতি তারিখ ১৬ আশ্বিনি মঙ্গ[ল] বারে প্রায় বেলা তিন প্রহর জিতা গৌট সমাপ্ত হইল। তিতি সষ্টী।

সন ১২৩৫ সাল মুক বছ্যর দেবাতা বরিসিল না য়[ত] এব পুতি লিখিলাম কোন কম্ম নাই আর গ্রামের লোক গৈতন[পুর] জাইতে লাগিল য়তএব ঢেলে ভাউ চব্বি[শ] সের ২৪ সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামের য়দ্যেখান লোকে অন্য জোটে নাই আর গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই[তি] লাগিল পেটের খাতিরে পলাইতে লাগিল অন্য গ্রামের লোক বলে বেলক্ষে লোক এ লোকে রাখা হবে না জদি রাখ[া] হয় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখ[া] জায় তবে ওই লোক মাহ কাতিক মাসে জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা[দের] দেসে জল হয়াছে বাড়ি জাই চলরে কপ্প বসাইতে হবে যতএব রাখে না আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই আর গ্রামে মনুস্য নাই আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় আর বোঙাঞি গ্রামে য়নেক কুড়খেক মণ্ডল আছে ইতি—সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসার—

দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাদ আর তালুক নারায়ন পোদাররে আর কি কহিব পউস মাসে লাগ্যাঁ জোড়ে

পউস মাসে নাগলি চাটুজ্য ফ[জ]দার গোমস্তা আর গোমস্তা রূপন নেউকি জোরে

নাইরে নাই মানিক মণ্ডলের লাগীল সুয়া এত খানেই—[পৃ. ৫ (।/০) বিশ্বভারতী পুঁথি সংখ্যা ৬২৩৯]।

(২)……শ্রীকবি কঙ্কনে গান ॥ ৪৩০ ॥ ইতি শ্রীশ্রীমঙ্গল চণ্ডীকার পুস্তক সমাপ্ত ॥০॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষিক নাস্তি দোসক ॥ ভিমস্বাপী রনেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥০॥ ভিম আদি করিয়া জে ভঙ্গ দেয় রনে। অবিস্কক মতিভ্রম মহামুনিগনে ॥ জদি বাটী বাড়ি হয় না লবে অপরাধ দোষ ক্ষেমা করি সভে করিবে আসির্ব্বাদ ॥ পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাই ॥ গবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই ॥০॥ ইতি লিখিতং শ্রীনন্দ-দুলাল দেবশর্ম্মনস্য। সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্টে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত হইল ॥ নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়ারির ঘরে পিড়াতে বস্যা লিখ্যা হইল ॥ শ্রীশ্রী মঙ্গলচণ্ডীকায়ৈ নমঃ শ্রীশ্রী সিবায় নমঃ শ্রীশ্রী জয় দুর্গায়ৈ নমঃ শ্রীশ্রী গুরুবে নমঃ সাং খণ্ডখোষ ॥ সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টি হইল সস্বি হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও২ জলাভূমে হইল টাকায় ১২ বার সের চালু ।✓১০ সাড়ে ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২॥০ আড়াই সের লবন ১৩ সের কলাই ১১ এগার সের তরিতরকারি নাস্তী সাক নাস্তী কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সর্ত্ত[র] বৎসরের মুন্বিসী বলেন আমরা কখন এমন স্বুনি নাই ইহাতে কত২ মন্বিসী মরিল বড়২ লোকের হাড়ী চাপে নাই নাং সন ১১৭৭ সালের মাহ ভাদ্রতক মহা প্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয়।

১৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩০ চারিসত্ত তিরিস লেচাড়্যি সমাপ্ত হইল—শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিস্বী নষ্ট হই[ল] মহা মন্বন্তর—[পৃ. ২০০ (১১।✓০), বিশ্বভারতী পুঁথি সংখ্যা ৬২৪০]।

পুঁথি-নকলের পরে, ধান, দূর্বা, সুপারি দিয়ে মঙ্গলাচরণের পরে ডোর পড়ত পোথার বহিরাবরণে। এবং নূতন গামছা, কাপড়, চেলী বা নামাবলীতে আয়ত হয়ে শ্রদ্ধাভরে ও সন্তর্পণে পুঁথিখানি ঠাঁই পেতো চণ্ডীমণ্ডপের বা দেউল-দেহারার কুলুঙ্গীতে। সেকালে রাজা-মহারাজা বা সম্ভ্রান্ত ধনী-গৃহস্থের বাড়িতে আলাদা ক'রে পুঁথি-সংগ্রহ রাখবার জন্যে ঘর থাকতো। পুরাতন চিঠি-পত্রে তার নাম পেয়েছি 'গাঁথাঘম' অর্থাৎ গ্রন্থগৃহ। সেকালেও পুঁথি কেনা-বেচা হ'ত। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত পুঁথি লোকে সাধারণতঃ কিনতে চাইত না।

✓কাল বদলে গেল। বাংলা দেশে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হ'ল। হ্যালহেড সাহেবের লেখা ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ছাপাতে গিয়ে বাংলা টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হ'ল হুগলী সহরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। টমাস, কেরি, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ বিদেশী ধর্ম প্রবক্তাগণের উদ্যোগে এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ স্বদেশী মহাত্মা-গণের আগ্রহে শ্রীরামপুরে এবং কলকাতার বটতলা থেকে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মাধবাচার্য প্রমুখ প্রাচীন কবিকুলের বাংলা পুঁথি ছাপা হল। সে-সময়ে ইংরেজী সংস্কৃতি তার

গদ্যময় সমৃদ্ধতর সাহিত্যাদি নিয়ে ধীরে ধীরে এদেশে প্রবেশ করছিল। ইংরেজী-শিক্ষার পক্ষপাতী সকলে তখন ঢ'লে পড়লেন সেইদিকেই। ক্রমে ক্রমে তার বেগ হ'ল প্রবলতর। ফলে, দেশের লোকে দেশের সাহিত্য, হাতে-লেখা পুঁথি-পত্রাদির কথা ভুলতে লাগল। ভুলে যেতে লাগল বিশেষ ক'রে উজ্জ্বল আলোক-প্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের অনেকেই। পুঁথি খুলতে লাগল মাত্র বাড়ির ইংরেজী-না-জানা মেয়েরা আর নিম্নবর্ণের লোকেরা। তুচ্ছ পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত চিকিৎসা জ্যোতিষের হস্তলিখিত গ্রন্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ল পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট।

সংস্কৃতির চর্চা করেন, অথচ ইংরেজী জানেন না, এই রকম লোকেদের কাছে, পুঁথির আদর এখনও কম নয়। বহুস্থানে এখনও সশ্রদ্ধ সংস্কারে গ্রন্থ 'নকলে' নেওয়া হচ্ছে, আমি জানি। বিশেষ ক'রে, তিলি, মালী, সদ্‌গোপ, কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোর, বেনে, মাহিষ্য, যুগী, পোদ, রাজবংশী, ধোপা, কলু, বাগদী, ডোম, চাঁড়াল, নমঃশূদ্র প্রভৃতি—এইসব বর্ণের লোক যাঁরা পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকেন, তাঁদের 'পণ্ডিত', 'দেয়াসী', 'দেউলে'-শ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা এখনও পুঁথির চর্চা করে থাকেন নিয়মিতভাবে। বিভিন্ন পূজা-পর্বে এখনও তাঁরা মঙ্গল-কাব্যাদির গান করে থাকেন। কোথাও কোথাও তাঁরা টোল-চৌপাড়ি পরিচালনাও করেন। ডোমপণ্ডিতের টোলে এবং কৈবর্ত পণ্ডিতের বাড়িতে অসংখ্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুঁথি আমি দেখেছি। দুর্গা-পূজায় চণ্ডীমঙ্গল, মনসাপূজায় মনসামঙ্গল, ধর্মঠাকুরের বারমতি গাজনে ধর্মমঙ্গল গান এখনো বহু স্থলে 'বাঁধা আসরে' হয়ে থাকে। এখন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণে করেন কথকতা আর রামায়ণ মহাভারতের গান। বাঁকুড়ানিবাসী 'ধামাতকর্ণী'-উপাধিক এক ব্রাহ্মণ সজ্জন সাম্প্রতিককালেও পশ্চিমবঙ্গে কথকতা করে বেড়ান। ব্রাহ্মণ ছাড়া, আর সকলে করেন আর সমস্ত পাঁচালী গান। আগে ব্রাহ্মণেও করতেন। কেবল পুঁথি লিখিয়েই ক্ষান্ত দিতেন না, তাঁদের স্বপ্নে-দেখা সেকালের লৌকিক দেবদেবীরা।

দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ ক'রে, অথবা বদান্য ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলকাব্য তথা লোকসাহিত্য রচনার জের সমাজে আজ পর্যন্ত চলছে। বিশেষ ক'রে, লৌকিক দেবদেবীর বিশেষ পূজায় এসব নিয়মিত গান করা হয়। সেইজন্যে বিশুদ্ধি রক্ষার বিশ্বাসে, তাঁরা এখনও ছাপা বই ব্যবহার করতে চান না। মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথির ভুলত্রুটিও তাঁদের ঐতিহ্য-সচেতন চোখ এড়ায় না। সুতরাং ছাপা বইএর উপর তাঁদের স্বাভাবিক ঘৃণা। কিন্তু দেখেছি, গ্রন্থ-নকলের আয়াস, এবং ছাপা বইএর সুলভতা তাঁদের এই মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করছে। ছাপা বই পেলে, তার বাহ্যিক মোহে মুগ্ধ হয়ে, অনেকে পুঁথি দিতে রাজী আছেন দেখেছি।

এইসঙ্গে একটা দুঃখের, কিন্তু মজার কথা বলি। সে হ'ল জাল পুঁথির কথা। সুখ্যাত গ্রন্থকারের প্রখ্যাত রচনার বাইরে, অনেক মেকি লেখা তাঁর নামে চলে থাকে। কিন্তু চলে কিভাবে?

লিপিকর, বিশেষ করে গায়েন-লিপিকরের মধ্যে অনেকে থাকেন স্বভাব কবি। তাঁরা যখন কোনো মূলগ্রন্থ নকল করেন, বিধিবদ্ধ গ্রন্থস্বত্ব না-থাকায়, স্বভাবতঃই মূল গ্রন্থকারের মূল রচনার মধ্যে তাঁর নিজের রচনা তিনি প্রক্ষেপ করে থাকেন। এমনকি, লিপিকরের রচিত গোটা বইখানিই, বা পদ পদাবলী তো বটেই, মূল প্রখ্যাত গ্রন্থকারের ভনিতায় চালিয়ে দিয়ে থাকেন।

এই রকম একটি সূত্র পেয়ে, অবাক্ হয়ে আমি একবার এক বৃদ্ধ লিপিকরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তাতে তাঁর উত্তর হল;—"বাবু, আমি আমার নাম চাই না। আমার গুরুর নামে আমার লেখা চলবে, এতেই আমার সুখ।"

তাঁর উত্তর শুনে হঠাৎ আমার মনে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি কৃত্তিবাস-সমস্যা, চণ্ডীদাস-সমস্যা, কবিচন্দ্র-সমস্যা ইত্যাদি পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের অসংখ্য সমস্যার গ্রন্থিগুলি যেন এক লহমায় দেখতে পেলুম।

✓উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরে কেরি, ওয়ার্ড, মার্সম্যান্ প্রমুখের উদ্যোগে এবং পরে, কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ও রাজা রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায়, বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। এবং বলা যায়, এই হ'ল বাঙ্গালা পুঁথি-সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা। বৃটিশ-মৃ্যজিয়মের লাইব্রেরীতেও বাঙ্গালা পুঁথির সংগ্রহ রয়েছে। স্বর্গত মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ব্যোমকেশ মুস্তফী, শিবরতন মিত্র, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ পূর্বসূরিগণ বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। এসব পুঁথির অধিকাংশই বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। ঢাকা-মৃ্যজিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, কোচবিহার দরবার-লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ ইত্যাদি স্থানেও বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। বিশ্বভারতীও এই বিষয়ে পিছিয়ে নেই। সেকথা পরে বিশদভাবে বলছি।

বাঙ্গালা-পুঁথি-সংগ্রাহকদের নমস্য স্বর্গত রামকুমার দত্ত একদা বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ বদলা দিয়ে, গাঁয়ের লোকের বাড়ি থেকে হাজার হাজার বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ ক'রে অসাধ্যসাধন করেছিলেন। ✓বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করতে গ্রামে গিয়ে, দেবস্থানে বসে অব্রাহ্মণ মালিক 'পণ্ডিতে'র অজ্ঞাতপূর্ব একমাত্র গ্রন্থের প্রচার হবে, তাঁদের নাম ছাপা হবে, সর্বোপরি তাঁদের গৃহদেবতার জহুরা জাহির হবে,—এই সব আশ্বাস অবশ্যই দিতে হবে। গায়নদের ও 'পণ্ডিত'-দের বাড়িতে পুঁথির চর্চা এখনও অব্যাহত আছে। এঁরা প্রসন্ন হ'লে, এঁদের বাড়িতে জীর্ণ আধারে রক্ষিত জীর্ণতর পুঁথিস্তূপ দেখতে পাওয়া যাবে।

বর্তমান বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরেও অসংখ্য বাঙ্গালা পুঁথি এবং দলিল-দস্তাবেজ ছড়িয়ে আছে এখনও। ✓ছোটনাগপুরের রাঁচী জেলার রাঁচী শহরের

সন্নিহিত নানা গ্রাম থেকে একদা নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ স্যানাটোরিয়ামের সহায়তায় আমরাও ঐ অঞ্চল থেকে কয়থী অক্ষরে লেখা বহু বাঙ্গালা পুঁথি সম্প্রতি সংগ্রহ করেছি। নাগরী, ফারসী, ওড়িয়া, মারাঠি, কয়থী, নেওয়ারী, চীনা, তিব্বতী ইত্যাদি অক্ষরের অন্তরালেও বাঙ্গালা পুঁথি আত্ম-গোপন করে আছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহের তিব্বতী এবং চীনা পুঁথিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠোদ্ধার করা হ'লে, তার মধ্যে থেকে বাঙ্গালা পুঁথিতে বিধৃত বিষয়ের জের কিছু-কিছু মিলবে বলেই আমার স্থির ধারণা।

বিশ্বভারতী পত্তন করার আগে থেকেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ পুরানো পুঁথি, ছড়া, গান, ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহের জন্যে কতো গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একখানি চিঠি থেকে তার নমুনা দিচ্ছি।—

"ওঁ / সাজাদপুর / অবন / আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগ্‌চে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করচি। তোমাদের বুড়ি দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলো না।—রবিকাকা"

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত বাঙ্গালা পুঁথি "যোগীর গান" আমরা প্রকাশ ক'রে দিয়েছি ১৯৪৯ সালে।

যাই হোক্, যত্রতত্র গ্রামে ঘুরে ঘুরে, পুঁথি-পত্রাদি, বা একটি এলোমেলো পুঁথিস্তূপ সংগ্রহ করতে পারলে দেখা যাবে, তাতে পুঁথির মালিকদের অজ্ঞাতসারে পুরুষানুক্রমে-রাখা নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থাদি সঞ্চিত রয়েছে। এই রকম একটি পুঁথিস্তূপ বহুভাগ্যে আমাদের আয়ত্ত হলে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের খ্যাত-অখ্যাত নানা মহলায় নানাভাবে আলোকপাত করা অবশ্যই সম্ভব হবে।

বাঙ্গালাদেশে ছাপাখানার পত্তন হতেই বাঙ্গালা পুঁথির কপাল পুড়লো। এদেশে ছাপাখানা বসলো, কিন্তু ছাপানোর যোগ্য বাঙ্গালা পুঁথি খুঁটিয়ে সংগ্রহ করা হ'ল না। মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হ'ল ; ফলে, কোণঠাসা পুরাতন পুঁথিরাশি অযত্নে উপেক্ষায় কালক্রমে ধ্বংস হ'য়ে যেতে লাগল। পোকা-মাকড়, উই-ইঁদুর, আবহাওয়া, বৃষ্টিবাদল, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন তো আছেই। উপরন্তু, রাজনৈতিক বিপর্যয়। বিশেষ ক'রে, পাকিস্থান-প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যন্ত পল্লীগ্রামে পুঁথি-সংগ্রহ যে কী ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের বোধ-গম্য হবার কথা নয়। পুঁথি নষ্ট হয় হোক, তবু কেউ সহজে তা হাতছাড়া করতে চান না। বংশানুক্রমিক অথবা স্বকীয় আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বহু সংস্কারের বাধা পুঁথি-হস্তান্তরের প্রবলতম অন্তরায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বহুকাল আগেই পূর্ব-পুরুষের যত্নের ধন পুঁথির তাড়া বিশুদ্ধ হিন্দুমতে পুষ্করিণী-নীরে অথবা গোময়-কুণ্ডে বিসর্জন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। যাঁরা এখনও সযত্নে রক্ষা করছেন, তাঁরা তথাকথিত

অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত। এঁদের প্রধান অপরাধ হ'ল দারিদ্র্য। গ্রামদেবতার 'দেউলিয়া'দের দারিদ্র্য এখন যেন দেবতাকেও দেউলে ক'রে ফেলেছে। দীন দেবতার পূজাপদ্ধতির পুঁথিপত্র অবহেলিত হবারই কথা। তথাপি অনেক পূজক 'পণ্ডিত' এখনও বহুযত্নে পুঁথিপত্র রক্ষা ক'রে আসছেন, সে আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা।

রাঢ় অঞ্চলে পূজা-কর্মের বৃত্তি-স্বরূপে, অর্থাৎ যজমানের পৌরোহিত্য করতে গিয়ে, বাঙ্গালা পুঁথি এখনও যাঁরা ব্যবহার করছেন, তাঁরা প্রায়শঃই নিম্নবর্ণের লোক। তাঁদের কাছ থেকে সহজে পুঁথি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। উচ্চ শ্রেণীর যাঁদের বাড়িতে পুঁথি আছে, বহুস্থলে সে আছে গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে বাড়ির পৈতৃক পরিত্যক্ত ও স্তূপীকৃত আবর্জনা-পুঞ্জের মধ্যে নির্জনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, চাইতে গেলেই, সেই আবর্জনাস্তূপের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। "নষ্ট হয় আমার ভিটেয় হোক পৈতৃক পবিত্র জিনিস কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না"—এই সংস্কার দেখা যায় সর্বত্র। সংগ্রাহক নাছোড়বান্দা হলে, মালিকের না-দেবার রোখই চড়তে থাকে। চরমে চড়লে পুঁথি উবে যায়।

অথচ, পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি অনাদরে ঠাঁই পেয়েছে তাঁদের ঘুঁটের মাচায়, রান্নাঘরের সাঙ্গায়, গোয়ালঘরে, পুরাতন আবর্জনা-স্তূপের অন্তরালে, বড়োজোর ভাঙ্গা সিন্দুকের গুমোট গহ্বরে। বাঁশতলায়, সারকুড়ে, পুকুরের জলে, নদীর স্রোতেও পুঁথি কম বিসর্জিত হয় নি। বাঙ্গালা পুঁথি রোগশয্যায় রেখে রোগমুক্তির আশাও করা হয়। আবার দেবতা ও উপদেবতা পুঁথিতে ভর করেছেন, এই প্রকার সংস্কারবশে সভয়ে এবং সশ্রদ্ধচিত্তে বাঙ্গালা পুঁথির স্তূপ দাহও করা হয়ে থাকে। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্ত্রের মতো পুঁথিকে গোপন করতেও চাওয়া হয়। বাপ-ঠাকুর্দার এই আচার লঙ্ঘন করলে বংশের 'হানি' হবে, সত্যিকার এই আতঙ্কে, পুঁথি-দেখার প্রশ্নই অনেকস্থলে ওঠে না। 'মন্ত্র নেওয়া হবে'—এ কথা কবুল করলেও বিশ্বাস করে না। জাত খোয়ালেও অনেকস্থলে পেট ভরে না। 'গানের দল' ক'রে, বা ছাপিয়ে তাদের এই গুপ্তবিদ্যা ফাঁস করে দেওয়া হবে, এই আশঙ্কা। গভর্নমেন্টের গুপ্তচরও ভাবে। 'ট্যাক্স' বসাবার জন্যে, দেবোত্তর সম্পত্তির খুঁটিনাটি ভিতরের কথা জেনে নেবার গোপন উদ্দেশ্যে পুঁথি দেখতে আসা হয়েছে, এই কথাও রটে যায়। লোকজন অন্তরালে রেখে ছদ্মবেশে এসেছে; পুঁথিগুলি হস্তগত করে তাঁদের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে নেবে, তাঁদের এই ভুল ধারণা অনেক স্থলে কিছুতেই ভাঙ্গতে পারা যায় নি। তাঁদের লাঠি-ঘেরা প্রহরাতেও একটিবার পুঁথির একখানি পাতাও অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় নি। আবার, পুঁথি আনবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে, খাঁটি কাপালিকের আড্ডায় পড়া গেছে; প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলেছে। অবশেষে, অন্দর মহলের জনান্তিক করুণায় উদ্ধারলাভ হয়েছে, এরূপ লোমহর্ষণ কাহিনীও আছে। শহরে বা শহর-ঘেষা পুঁথির মালিকদের মারোয়াড়ী-আতঙ্কও অভিজ্ঞতালব্ধ। ইয়োরোপে আমেরিকায় বাঙ্গালা পুঁথির বাজার আছে,—এই ধারণাও জন্মেছে।

ব্রাহ্মণের টোলে সংস্কৃত নিয়েই কারবার। এবং সেইসব সংস্কৃত পুঁথির প্রামাণ্য সংস্করণ সাধারণতঃ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বহুবার ছাপা হয়ে গিয়েছে। তবে, সেগুলি নেড়ে-ঝেড়ে পুরাতন চিঠিপত্র, চিরকুটাদির আশায় তা সংগ্রহ করা আবশ্যক। কিন্তু, ব্রাহ্মণ ছাড়া, যে-কোনো জাতির বাড়িতে এখনও রক্ষিত পুঁথিগুলির প্রতি বিশেষ অবহিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য ; বিশেষতঃ, যাঁরা পাঁচালী-গায়ক, এবং লৌকিক দেবদেবীর বা ধর্মঠাকুরের পূজক। তাঁদের কিন্তু ধারণা, 'ধর্মপণ্ডিত নিরস্ত্র', এই পুঁথিগুলিই তাঁদের 'অস্ত্র'। সুতরাং পুঁথি হাতছাড়া করা তাঁদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু, এই সকল 'অস্ত্রই' আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। পুঁথি নকল করিয়ে, বরং একখণ্ড তাঁদের দেওয়া যায়। কিন্তু, পুঁথি সংগৃহীত হওয়া অতি আবশ্যক। জাতীয় সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় পেতে চাইলে লুপ্তাবশিষ্ট এই পুঁথিগুলি খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করা প্রাথমিক কর্তব্য। 'যক্ষের ধন' তাঁরা সহজে আমাদের হাতে তুলে না-দিলে, আধুনিক যে-কোনো 'অস্ত্র' যেভাবে হোক, আমাদের প্রয়োগ করতে হবে।

বাঙ্গালাদেশে বিশেষ ক'রে রাঢ় অঞ্চলের নানা জেলায় বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে আমাদের ধারণা জন্মেছে, পুঁথি-সংগ্রহ অতি কঠিন ব্যাপার। শুধু কঠিন নয়, অনেক স্থলে অসাধ্য। ছলে বলে, কৌশলে, সৎ এবং অসৎ যে-কোনো উপায়েও কোনোক্রমে প্রবেশ করা যায় না, এমন স্থান এখনও অনেক রয়েছে। অথচ, সেখানে বিশেষ 'বস্তু' আছে। এবং এখনও তার কিছুই উদ্ধার হয় নি।

তবে, গ্রামে সহৃদয় লোক নাই, তা নয়। তাঁদের যোগাযোগে পুঁথির মালিকদের বিশ্বাস জন্মাতে হবে। এবং পুঁথিগুলি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রকাশের যথাযথ বিবরণ-সম্পর্কে প্রত্যয় করাতে হবে। কোথায়ও জবরদস্তি চলবে না। ফটোস্টাট্ কপির কথাও সেখানে চিন্তা করা যাবে না। যে-কোনো প্রকারে 'বাগে' আনতে হবে। জবরদস্তিতে পুঁথি উধাও হবে। যাঁরা এখনও পুঁথি দেখে গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করেন, তাঁদের গ্রন্থের মূল্যবাবদ অর্থ-সাহায্য করতে হবে। তাঁদের প্রয়োজন মতো গ্রন্থের নকল বা ছাপা বই দিতে হবে। কোনো মালিক-বাড়িতে গৃহদেবতা থাকলে, সেই গৃহদেবতার নামে 'দর্শনী' বা নিত্যসেবা বাবদ স্থায়ী বৃত্তিদান করবার সফল প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। অনেক স্থানে তাঁদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে হবে ; মন যোগাতে হবে দিনের পর দিন। তবে যদি 'কায়মনচিত্ত লাগাইয়া' বহু কৃচ্ছ্রসাধনার পরে আসে অভাবনীয় সফলতা।

বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা-প্রস্তুতি পুঁথি-সংগ্রহের পরের ধাপ। এই বিষয়ে কাজ হয়েছে কিছু কিছু। কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি।

৺১৩১১ বঙ্গাব্দে J. F. Blumhardt বৃটিশ-ম্যুজিয়ম-লাইব্রেরীর বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয়

সংখ্যা সংকলন করেন। এই গ্রন্থের 'নিবেদন' লিখেছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়। এই 'নিবেদন'-অংশে বাঙ্গালা পুঁথির ইতিহাস ও বাঙ্গালা পুঁথিতে ধৃত বাঙ্গালার লৌকিক কাহিনীর বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। ১৩২১ বঙ্গাব্দে মুন্সী আব্দুল করিম পুঁথি-বিবরণের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা বের করেছিলেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা সংকলন করেন শিবরতন মিত্র। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে এই বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা সম্পাদন করেছিলেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। এই একই সালে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন J. F. Blumhardt। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামায়ণের পুঁথির পরিচয় প্রকাশ করেন বসন্তরঞ্জন রায় ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ঐ একই সনে সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি-বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা সংকলন করেন বসন্তরঞ্জন রায়, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। এই গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানুযায়ী প্রাচীন পুঁথির বানান সম্পর্কে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আলোচনা রয়েছে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাবলী পুঁথি, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পুঁথিগুলির বিবরণ সংকলন করেছিলেন বসন্তরঞ্জন রায়, মণীন্দ্রমোহন বসু ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে Introduction লিখেছেন, পুঁথি-সংগ্রহের ইতিহাস-রূপে সে অতি চিত্তাকর্ষক রচনা। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি মহাভারত পুঁথির পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন মণীন্দ্রমোহন বসু। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি-বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যা সংকলন করেন তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখেছিলেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-হাজারের বেশি পুঁথির সাধারণ বিবরণী প্রকাশ করেন মণীন্দ্রমোহন বসু। বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বাঙ্গালা পুঁথির হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃত তালিকা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে সংশোধন ও সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা ইংরেজী ভূমিকায় উদ্ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মূল অভিভাষণ ও তার শেষাংশ প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণের প্রথম ভাগ সংকলন করেন শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুঁথির তালিকার প্রথম খণ্ড সংকলন করেন শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় আজ ৪১ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির তালিকা-সমন্বয় (Catalogus Catalogorum) প্রস্তুত করছেন। জার্মান পণ্ডিত Aufrecht-এর আদর্শে তাঁর গ্রন্থ সংকলিত হচ্ছে। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এর কোনও অংশ প্রকাশিত হয়নি।

বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথি-সংগ্রহের মুদ্রিত বিবরণী প্রথম প্রকাশ করা হয় ১৯৫১

সালে—'পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড' নাম দিয়ে। এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে। এই তিন খণ্ডে ক্রমিক সংখ্যার মোট ১,৫০০ পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। এই তিনটি খণ্ডেরই সম্পাদক বর্তমান লেখক।

বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিয়ামের 'বাংলা পুঁথির তালিকা' সঙ্কলন করেছেন মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ১৯৫৬ সালে।

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগ থেকে, আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সংগৃহীত পুঁথির সংকলিত বিবরণ, 'পুথি-পরিচিতি' নাম দিয়ে আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া, কোচবিহার দরবার লাইব্রেরীর পুঁথি-বিবরণী প্রকাশ করেছেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। এশিয়াটিক সোসাইটির ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-সংগ্রহের অংশতঃ আরও পরিচয় সম্প্রতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল এবং মণীন্দ্রমোহন বসুর সহায়তায় তিনি প্রকাশ করেছেন।

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

বাঙ্গালাদেশের পুরাতন সংস্কৃতির সন্ধান-কল্পে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদা যা ভেবে-ছিলেন, এবার তা বলছি।—শুধু বলা নয়, তাঁর বাণী আজ আমাদের অনুধাবন ক'রে কাজে রূপ দেবার সুসময় এসে গেছে।

"য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গ-রূপে পরিচিত হইতে চাহে—এবং ছড়া রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

"বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই···অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।···বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে।··· নূতনকালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না।···ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত সম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।...আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্ত তুচ্ছ নহে...।

...দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে...তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।...কথাটা...শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সঙ্কলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো।

"আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।...দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কত বড়ো একটা গালি, তাহা আমরা অনুভব করি না।

"...প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃতসাহিত্য, লোকবিবরণ...প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি, পুরালিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।"

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা—আচার্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি ১৩০৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মধ্যেকার। আজ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ চলছে। এক শতাব্দীর ত্রিপাদ কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল ; আমরা এই বিষয়ে বিশেষ কিছু করতে পেরেছি কিনা, তার সমীক্ষা করলে হতাশ হতে হয়। এবং এক কথায়, আমাদের বর্তমান আত্মহননের মূলে হ'ল, আমাদের স্বদেশী এই ঐতিহ্য-বোধের অভাব। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই ঐতিহ্য-সংগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ১৯৪৬ সাল থেকে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে নবপর্যায়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলুম। তাতে কি ফললাভ করা গেছে, বিশ্বভারতীর গবেষণা-গ্রন্থমালার তালিকা দেখলেই তা জানতে পারা যাবে। বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগের ইতিবৃত্ত এই সঙ্গে বিবৃত করা গেল।

॥ বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ ॥

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় পত্তন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্যোগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আশা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে সেকালের ও একালের বিশ্বসংস্কৃতির চর্চা হবে এবং তাঁর এই ভাবনা থেকেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। সেকালের ভারতীয় সংস্কৃতির উপকরণ পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যেই মুখ্যতঃ নিহিত আছে তার সন্ধান তিনি ভালোভাবেই জানতেন। বিশ্বভারতীর কর্মধারায় একটি প্রধান অংশ ছিল, দেশের নানা স্থান থেকে প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও আলোচনা।

বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের দ্বিতীয় বৎসরে (১৯২৩ খ্রী.) শান্তিনিকেতনে পুঁথি-বিভাগের সূত্রপাত হ'ল। পুণার ভাণ্ডারকর রিসার্চ্ ইন্‌স্টিটিউট্ থেকে মহাভারতের বিবিধ-পাঠ-সমন্বিত (ভেরিওরাম্) সংস্করণ প্রকাশের আয়োজনে এই বৎসরেই বিশ্বভারতী সহযোগিতা করতে সম্মত হন। অধ্যাপক উইন্‌টারনিট্‌স্ তখন এখানে ছিলেন। পুণা থেকে অধ্যাপক, উদ্‌গীকর শান্তিনিকেতনে এসে অধ্যাপক উইন্‌টারনিট্‌সের সঙ্গে কাজ ক'রে মহাভারতের আদিপর্বের আদর্শ-পাঠযুক্ত একটি সংস্করণ প্রস্তুত করলেন। শান্তিনিকেতনে মহাভারতের সংস্করণ প্রস্তুতের অন্যতম কেন্দ্র স্থাপিত হল। পুঁথি-বিভাগ তখন সবে খোলা হয়েছে। অনেক দুর্লভ পুঁথি সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফলে, শান্তিনিকেতন সমগ্র মহাভারতের অভিনব সংস্করণ প্রস্তুতের প্রশস্ত ক্ষেত্র ব'লে বিবেচিত হ'ল।

বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ তখন আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী। সেই সময়ে ত্রিবান্দ্রামের স্বর্গত পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর যোগাযোগে বিশ্বভারতীতে নানা ভাষার বহু মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপি সুসংবদ্ধ চেষ্টায় সংগৃহীত হ'ল। আরও অনেকে তখন সে দুরূহ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছিলেন।

অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সস্ত্রীক আশ্রমে এসে বিনা বেতনে পুঁথি-সংগ্রহের কাজে যোগ দিলেন। পুঁথি-বিভাগ সংগঠনে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম থেকে মূল্যবান ও দুর্লভ অসংখ্য পুঁথি তিনি অনায়াসে সংগ্রহ ক'রে ফেললেন। দক্ষিণ ভারত থেকেও তিনি পুঁথি-সংগ্রহ করে আনলেন। বিশ্বভারতীর পুঁথি-সংগ্রহের মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের নতুন পাঠ-সম্বলিত কয়েকখানি পুঁথি ছিল। মহাভারতের সংস্করণ প্রস্তুত করার সময় সে-গুলি কাজে লাগলো। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন মহাভারতের পুঁথি-সম্পাদনার স্থানীয় কার্য-পরিচালক। সম্পাদনার কাজে সহায়তার জন্যে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন অধ্যাপক সোৎসাহে যুক্ত হলেন। নেপাল-রাজকীয় পুঁথিশালা থেকেও কিছু পুঁথির প্রতিলিপি আনানো হয়। ঢাকা থেকেও কিছু পুঁথি আনানো হয়েছিল।

অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওড়িষ্যা, কেরালা ইত্যাদি অঞ্চলে সফর ক'রে হাজার হাজার পুঁথি সংগ্রহ করে এনে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে স্তূপ করলেন। সংগৃহীত পুঁথির তালিকাও তিনি

প্রস্তুত করেন। কিন্তু পুঁথিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ও পাঠোদ্ধারের জন্যে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হয়। অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সুপারিশে ১৯২৪ সালে তামিল ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রীআয়াস্বামী শাস্ত্রী শিরোমণি পুঁথি-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। এঁর পরে, গ্রন্থাগারিকের অভিমতে ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, স্বর্গত শশধর ব্যানার্জী শ্রীঅনাথবন্ধু দে-এর সহায়তায় কিছুকাল পুঁথি-বিভাগে কাজ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও অতঃপর কিছুকাল এই সকল নানা লিপিতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলির যথাযথ যত্নগ্রহণে সর্বাত্মক উদ্যোগ স্তিমিত থাকে। তৎকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুঁথি-সংরক্ষণের প্রভূত প্রযত্ন করেন। কিন্তু কুশলী লোকের অভাবে বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগের অচল অবস্থা দূরীভূত হয় নি।

শেষে, ১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আগ্রহে এবং ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের সুপারিশে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমান লেখক বিশ্বভারতীর রিসার্চ-ফেলো স্বরূপে পুঁথি-বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করেন। ফলে, পুঁথির কাজ পুনরুজ্জীবিত হয়। পূর্বেই তাঁর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। তাঁর কর্মধারার পরিকল্পনায় তিনটি অংশ ছিল—(১) পুঁথি-সংগ্রহ, (২) তালিকা-প্রস্তুতি ও (৩) প্রাচীন পুঁথি-সম্পাদন। বিশ্বভারতীতে কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে রক্ষিত বাঙ্গালা পুঁথিগুলির বিষয়-বিন্যাস, তালিকা-প্রস্তুত ও দুষ্প্রাপ্য সমস্যাবহুল, নবাবিষ্কৃত পুঁথিগুলির সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেছিলাম। পুঁথি-সংগ্রহও চলতে লাগলো পুরাদমে। রাশি রাশি পুঁথি সংগৃহীত হ'ল।

বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর আমলে ১৯৪৮-৪৯ সালে সিউড়ীর প্রসিদ্ধ "রতন লাইব্রেরী" সংগ্রহের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙ্গালা পুঁথি খরিদ করা হয়। ফলে, তখনই বিশ্বভারতীতে বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে পাঁচ হাজারের উপর।

১৯৫০ সালে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের দক্ষিণী লিপিতে লিখিত প্রায় আড়াই হাজার পুঁথি বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আদেয়ারে প্রেরণ করেন। এর পরিবর্তে আদেয়ার পুঁথি-বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সংগ্রহের বঙ্গাক্ষরে লেখা পুঁথিগুলি বিশ্বভারতীতে বদলা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বহু চেষ্টার ফলে, প্রতিশ্রুত পুঁথিগুলির নামমাত্র কিছু সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। গোড়ার দিকে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত পুঁথি-সংগ্রহ বোলপুর-ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একদা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেছিলেন।

১৯৪৬ সাল থেকে অদ্যাবধি বর্তমান লেখক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সফর ক'রে বহু পুঁথি ও দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করেছেন। ছোটনাগপুর থেকেও কয়থী অক্ষরে লেখা বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে পুঁথি উপহার দিয়েছেন এবং বিক্রয় করেছেন। উপহার-প্রদাতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন

স্বর্গত ব্যারিস্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্মকর্তা-স্বরূপে তাঁর বহুমুখী প্রেরণায় বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগের কাজ তখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানে (জুন, ১৯৬৯) বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যা ৬২৪০।

বিশ্বভারতীর পুঁথি-সংগ্রহ থেকে নাথ-সম্প্রদায় ও নাথ-সাহিত্যের উপর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং প্রকাশ মাত্র গ্রন্থখানি পণ্ডিত মহলে সমাদৃত হয়। ১৯৫১ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা-পুঁথি-সংগ্রহের বিশদ-বিবরণী 'পুঁথি-পরিচয়' গ্রন্থমালা প্রকাশিত হ'তে থাকে। ইতিহাসে ও সংকলনে 'পুঁথি-পরিচয়' অভিনব গ্রন্থ। এর মধ্যে এর তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দলিল-দস্তাবেজ-সংগ্রহ থেকে একখানি নতুন ধরনের গ্রন্থ 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' প্রকাশ করা হয় ১৯৫৩ সালে। এর 'প্রবেশক'-খণ্ডগুলি বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে।

বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজের তখন (১৯৫১ খ্রী.) সংখ্যা ছিল সাকুল্য হাজার খানেক। ১৯৫৮ সালে শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত সুরুল গ্রামের সরকার বাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার শ্রীকান্তিচন্দ্র সরকার তাঁদের মহাফেজ-খানা থেকে ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিশ্বভারতীকে দান করেন। ফলে, এই সংখ্যা সম্প্রতি প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের অখণ্ডিত ও অপরিজ্ঞাত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পুঁথিগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 'সাহিত্য-প্রকাশিকা'-গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এর ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অদ্যাবধি বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগ থেকে একুনে চৌদ্দখানি মৌলিক প্রামাণ্য গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করা হ'ল।

১৯৪৭ সাল থেকে বিদ্যাভবনের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক বর্তমান লেখক বাঙ্গালা পুঁথি নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন এবং এখনো করছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীর ও অন্য নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগে এসে গবেষণা করে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন।

বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগে পুঁথি-সংগ্রহ, পুঁথির তালিকা প্রস্তুত, পুঁথি-সম্পাদন, গ্রন্থ প্রকাশ ও গবেষণার কাজ ১৯৪৬ সাল থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। বর্তমান লেখক ১৯৫৭ ও ১১৫৯ সালে সরকারীভাবে পুঁথি-বিভাগের যথাক্রমে সংরক্ষক ও সম্পাদক নিযুক্ত হন।

সমগ্র পুঁথি-সংগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ১৯৫০ সালে বিদ্যাভবনের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছিলেন স্বর্গত অজিতচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৯৫২ সালে পুঁথি-বিভাগের সংরক্ষকরূপে বিদ্যাভবনের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্য। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর নির্দেশে বাঙ্গালা বিভাগের প্রশিক্ষক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও গবেষক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সাল থেকে কিছুকাল পুঁথি-বিভাগে যথাক্রমে দেখাশুনা করেছিলেন এবং নিজেদের গবেষণাও চালিয়েছিলেন। পরে, স্বতন্ত্র বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগের জন্যে ১৯৬০

সালে সহকারী নিযুক্ত হলেন শ্রীনৃত্যগোপাল বারিক। তাঁর পরে ১৯৬৩ সালে সহকারী নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীগৌরহরি সাহা। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সাল থেকে সমগ্র পুঁথি-বিভাগের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য।

বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগে বাঙ্গালা পুঁথি ছাড়া সংস্কৃত, পার্সী, ওড়িয়া, হিন্দী, তিব্বতী, চীনা ও জাভানী পুঁথি আছে। বিশ্বভারতীর সংস্কৃত পুঁথি-সংগ্রহ লক্ষণীয়। এর ক্রমিক সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি। ১৯৫৭ সালে শ্রীসুধেন্দুমোহন সিংহ সংস্কৃত পুঁথি-বিভাগের সংরক্ষকের কাজে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মিত্র সংস্কৃত পুঁথির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। শ্রীমিত্রের পরে ১৯৬১ সালে সংস্কৃত পুঁথির সংরক্ষক ও সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষাল। ডক্টর ঘোষাল বর্তমানে সংস্কৃত পুঁথি-বিভাগের কার্যভার পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তিনি দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথির সম্পাদনায় ব্যাপৃত আছেন।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সমস্ত পুঁথি বিদ্যাভবনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানদের মৌল তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের নূতন পরিকল্পনায় পুঁথি-সংরক্ষণের সম্যক্ ব্যবস্থা হচ্ছে।

পরিশেষে, লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহে বিশ্বভারতীর দশদফা কর্মক্রমের কথা ব'লে প্রবন্ধ শেষ করছি।—

(১) হাতে-লেখা পুরাতন পুঁথি—তুলোট কাগজ, তালপাতা, তেরেটপাতা, ভূর্জপত্র, গাছের ছাল, কিংবা চামড়ার ওপর লেখা, বাঙ্গালা, নাগরী, ওড়িয়া, পারসিক বা যে কোন অক্ষরে লেখা, যে কোন ভাষার পুঁথি—মুসলমান ও হিন্দু সমাজের যে কোন বর্ণের বাড়িতে বা টোলে, মন্দিরে এখনও অবহেলায়, অনাদরে রক্ষিত বা অবশিষ্ট আছে, সেগুলি নির্বিচারে এখনই সংগ্রহ করতে হবে। খুব পুরানো ছাপা বইও পুঁথির মতন সমান দরকারী।

(২) প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির, মসজিদ, রথ, দোলমঞ্চ, দালানবাড়ি ইত্যাদির লিপি, টেরাকোটা, কারুকার্যের ছাপ Stampage বা Rubbing বা ফটো-সমেত বিস্তৃত বিবরণী—অবস্থান, অবস্থা, দৈর্ঘ-প্রস্থাদি আনতে হবে।

(৩) প্রাচীন মূর্তি (প্রস্তর বা মাটির—তাতে খোদিত লিপি থাকুক বা না থাকুক), তাম্রপট্ট, মুদ্রা, শিলালেখাদি এবং ব্যক্তিগত পুরাতন চিঠিপত্র, হিসাব ও দলিল-দস্তাবেজ এখনই সমস্ত সংগ্রহ করে ফেলতে পারলে উত্তম হয়।

(৪) পুরাতন স্তূপ, ডিপ বা ঢিপি, গড়, জোল, সায়ের, ভাগাড়, দীঘি, পুরাতন পুকুর ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ ও তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্পাদি লিখে নিতে হবে।

(৫) গ্রামের ব্যক্তিগত বা বার-উয়ারি দেবদেবী ও তাঁদের পূজো-পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ যেমন, ধর্মঠাকুর—তাঁর পূজারী ও পূজা, গাজন, বলি, ভোগ; শিবঠাকুর—তাঁর

গাজন ; মনসা—তাঁর সয়লা, ঝাঁপান ; করমাডাণ্ডি ; মঙ্গলচণ্ডী—শনি মঙ্গলবারে তাঁর বিশেষ পূজা, মেলা, যাত ; দিদি-ঠাকরুণ-বুদ্ধপূর্ণিমায় মুচি-পণ্ডিতের পূজা ; শীতলার রথ, দোল ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে পীর-পীরানীর কাহিনীও চাই। পূজার ধ্যান-মন্ত্র-ছড়াদি ও বিভিন্ন গীত টুকে আনা চাই।

(৬) গ্রামের পুরাতন কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ। মাটি, কাঠ, বাঁশ, লোহা, তামা, পিতল, চূণ, শাঁখ, সূতো, পাতার কাজ, পট, পুতুল, রেশমের কাজ, বেতের কাজ, শোলার কাজ, গালার কাজ, পুঁথির পাটা, ভিত্তিচিত্র, জরির কাজ, কাঁথা, আলনা, পালান ইত্যাদিতে কড়ির বা বিনুনির কাজ ইত্যাদি এসব যে-গ্রামে যা মিলবে, সব নির্বিচারে সংগ্রহ করতে হবে।

(৭) লোকসংগীত সংগ্রহ—আখড়াই, বাউল, কীর্তন, যাত্রা, কবি, তরজা, ভাদু, ভাজুই, পটুয়া, তুষু, লেটো, অ্যালকাফ, ময়ূরপঙ্খী, পাঁচালী, মনসার ভাসান, রামায়ণ, আনন্দলহরী, ঝুমুর, রস্‌কে, ঘেটু, বোলান, সাপুড়ে ইত্যাদি—এইসব ছড়া গান, যাবতীয় বাঙ্গালা তন্ত্রমন্ত্র যা মিলবে, সংগ্রহ করা দরকার। আবশ্যকবোধে টেপরেকর্ড করানো যেতে পারে।

(৮) প্রবাদ, প্রবচন, ব্রতকথা, মেয়েলী ছড়া,—যত অশ্লীল হোক, প্রবীণা মেয়েদের নিকট, বা যাঁর নিকট পাওয়া সম্ভব, লিখে নিতে হবে।

(৯) বর্তমান গ্রামের পুরাতন সরকারী ও বেসরকারী পরিচয়-সংগ্রহী। গ্রাম্যদেশী শব্দ সংগ্রহ। গ্রামীণ সমস্তবৃত্তির এবং কৃষিযন্ত্রের, বিভিন্ন গ্রামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম-তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত "বঙ্গীয় প্রাদেশিক শব্দকোষ"-সংকলন গ্রন্থের তথ্য সমাহৃত হবে এই সূত্রেই। এই সংগ্রহ অতি জরুরী।

(১০) পুরাতন গাথা, কাহিনী, রূপকথা, কিংবদন্তী, ঐতিহাসিক ছড়া, ভৌতিক গল্প ও লোক-বিশ্বাস—এ সবের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী

নরেশচন্দ্র জানা

রাধাকৃষ্ণলীলা বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ নামের যুগল ব্যবহার এবং কৃষ্ণপ্রিয়তমা হিসাবে রাধা নামটির ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। কৃষ্ণ নাম ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়।[১] পরবর্তীকালে ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাওয়া যাচ্ছে।[২] কিন্তু এই কৃষ্ণের সঙ্গে 'গোপীশতকেলিকার' কৃষ্ণের সম্পর্কের সঠিক সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।[৩]

১। ঋগ্বেদে যে কয়বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাতে দু-এক স্থান ছাড়া সর্বত্র কৃষ্ণ ঋষি বলেই পরিচিত। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের ৫ম ঋকে এক কৃষ্ণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে 'শিকারী পক্ষী' অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। অথর্ব বেদের (১১.২.২) এবং শাঙ্খায়ন-আরণ্যকের (১২.২৭) দুই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫.২.৬.৫ ; ৬.১.৩.১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১.১.৪.১ ; ৩.২.১.২৮) "মৃগ" অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৭৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ ঋকে আপনাকে কৃষ্ণ বলে পরিচয় দিয়েছেন।

২। 'তদ্ হ এতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ আপিপাস এব স বভূব'......(৩।১৭।৪)। এখানে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলা হয়েছে। ঋগ্বেদোক্ত কৃষ্ণ সম্পর্কে অনুক্রমণীকার বলেছেন—এই কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশ্য। এ থেকে বৈদিক কৃষ্ণের সঙ্গে ঔপনিষদিক কৃষ্ণের অভিন্নতা পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে পোষণ করেন। দ্রষ্টব্য : R. G. Bhandarkar—Vaisnavism, Saivism and minor religious systems (1913), pp. 11-12.

৩। 'It is noteworthy that the identity of the Vedic Krisna with the Epic Krisna is not at all supported by the Puranic tradition. We have no description, either in the Epic or in the Purana, of Krisna as a seer of Vedic Mantras or as a pupil of an Upanisadic seer. In the Puranic tradition the name of Vasudeva-Krisna's teacher is given as Kasya Samdipani of Avanti, and that of his initiator as Garga. As a Krisna, father of Visvakaya, is mentioned in Rig-veda i. 116. 23 and i. 117. 7, and a Krisna Harita in Aitareya Aranyaka iii. 2. 6, it is clear that Krisna is not an uncommon non-divine name ; but the attempts to connect or identify these Krisnas, or to establish the tradition of a sage Krisna 'from the time of the Rig-

গোপীলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কৃষ্ণ তার সূচনা বোধ হয় পুরাণ-মহাভারতের যুগ থেকে।[৪] মহাভারতে বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ আছে এবং সভাপর্বে কুরুসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্তুতি করার কালে "গোপীজনপ্রিয়" বলে সম্বোধন করেছেন দেখা যায়, কিন্তু রাধার কোন উল্লেখ নেই।[৫] কৃষ্ণের গোপীগণসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা স্পষ্টরূপে পাওয়া যায় খিল হরিবংশে। হরিবংশে কৃষ্ণলীলা বিস্তৃতভাবে আছে। বিষ্ণুপুরাণেও আছে। কিন্তু রাধার নাম কোথাও নেই। কৃষ্ণকাহিনীর প্রধান কাব্য ভাগবতপুরাণেও রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আছে, কৃষ্ণ রাসমণ্ডল থেকে একজন গোপীকে নিয়ে অন্তর্হিত হন। অন্যান্য গোপীরা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে এক ব্রজবধূর পদচিহ্ন দেখতে পায় এবং তার উদ্দেশে বলে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥—১০।৩০।২৮

vedic hymns to the time of the Chandogya Upanisad', as R. G. Bhandarkar suggests, have not, so far, proved very successful. All that can be said without dogmatism is that there are the Vedic and Upanisadic Krisnas, on the one hand and the Epic and Puranic Krisna, son of Vasudev, on the other, but that the links which would connect or identify them beyond all doubt are unfortunately missing'.—S. K. De: Aspects of Sanskrit Literature (1959), p. 32.

৪। একাদশ দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসনে গোপীশতকেলিকার কৃষ্ণকে মহাভারতের সূত্রধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে—গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ। অর্ঘ ঃ পুমান্ অংশকৃতাবতারঃ প্রাদুর্বভূব ॥

দ্রষ্টব্য ঃ Epigraphia Indica (Edited by Sten Konow), Vol. XII, p. 30.

৫। গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ॥—২।৯০।৪৫ (নির্ণয়সাগর প্রেস সং) উল্লেখনীয় যে, ফ্রাঙ্কলিন এডগার্টন কর্তৃক সম্পাদিত এবং পুণা ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহাভারতের সভাপর্বে এ অংশ নেই। পণ্ডিতেরা এ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে ডঃ সুশীলকুমার দে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—'Even if Draupadi in the Mahabharat invokes Krisna as 'dear to the Gopis' (Gopi-jana-priya) in a passage which is now proved to be an interpolation, the Great Epic hardly takes into account the Gopi-legend, which assumes importance in the later cult'.—S. K. De : Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal (1961), p. 6.

[এর দ্বারা নিশ্চয়ই ভগবান ঈশ্বর হরি আরাধিত হয়েছেন, যে কারণে গোবিন্দ আমাদের ছেড়ে প্রীত হয়ে একে নিভৃতে এনেছেন।]

শ্রীমদ্ভাগবতের টিপ্পনীকারেরা এই 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটি থেকে রাধা নাম খুঁজে বার করার প্রয়াস পেয়েছেন।[৬] এভাবে রাধা নাম আবিষ্কারের চেষ্টাকে বাদ দিলে পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদিতে রাধা নাম স্পষ্টতঃ পাওয়া যায়। তবে অধুনা প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রাচীনতা সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে সংশয় বর্তমান।[৭] আর পদ্মপুরাণের প্রাচীনতাকে তাঁরা স্বীকার করে নিলেও রাধাকৃষ্ণলীলাকে সম্পূর্ণরূপে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করেন।[৮] পুরাণে-উপপুরাণে, শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদিতে রাধার উল্লেখ সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও

৬। এখানে 'অনয়া আরাধিতঃ' কিংবা 'অনয়া রাধিতঃ' দুটি পাঠই নেওয়া চলে। অর্থ উভয়ত্রই এক। শ্রীধরস্বামী এর টীকায় কিছু বলেন নি। সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব-তোষণীতে বলেছেন—'অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতম্।' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'সারার্থদর্শিনী' টীকাতে বলেছেন—'নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধামিতঃ প্রাপ্তঃ' ইত্যাদি। 'বিশুদ্ধরস-দীপিকা' নামক একটি ভাগবতের টীকাতেও বলা হয়েছে—'তথা রাধিতঃ রাধামিতঃ প্রাপ্তঃ ইত্যর্থঃ'। রামনারায়ণ তাঁর 'ভাবভাববিভাবিকা' টীকাতে বলেছেন—'অত্র রাধিতঃ অনয়া ইতি রাধেতি দর্শিতম্।' শুকদেব তাঁর 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ' টীকাতে বলেছেন—'যাং রহঃ একান্তং স্থানমনত্তয়া নূনং নিশ্চিতং হরিঃ খলু রাধিতঃ রাধা সঞ্জাতাস্য তথা তারকাদিভ্য ইতচ্ রাধাকৃষ্ণবিহারে হেতুভূতেয়ম্ ইত্যর্থঃ'। ধনপতি সূরি তাঁর 'ভাগবতগূঢ়ার্থদীপিকা' নামক টীকাতে বলেছেন—'অনেন রাধয়তি আরাধয়তীতি আরাধ্যতে বা রাধা ইতি অর্থাৎ তন্নাম সূচিতম্।' দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (নিত্যানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯৬৪ সম্বতে বৃন্দাবন থেকে প্রকাশিত), পৃ. ১১৫০-৫৩।

৭। উইলসন মনে করেন যে, এই পুরাণ মুসলমান আক্রমণের পরে রচিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য ঃ Essays (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রেনহোল রোষ্ট সম্পাদিত), Vol. I, p. 120.

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন যে, এই পুরাণ প্রাচীন পুরাণের রাঢ়ীয় ও অর্বাচীন সংস্করণ। দ্রষ্টব্য ঃ পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ), ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, আষাঢ়, পৃ. ৯৪-১০৪।

ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরাও মন্তব্য করেছেন যে, মূল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বহু পূর্বে লুপ্ত এবং অধুনা প্রচলিত ঐ পুরাণ মূলকে ভিত্তি করে বহু পরে রচিত। দ্রষ্টব্যঃ **Studies in the Genuine Agneya-Purana alias Vahni-Purana, Our Heritage (July-December, 1953), Vol. 1, pt. II, p 209.**

৮। **'Moreover, all these books contain references to fairly modern aspects of the Visnu cult, such as the adoration of Radha as a Goddess, the sanctity**

সুচিন্তিত আলোচনার পর ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত পরে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ —দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'পুরাণ-উপপুরাণে, শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদিতে রাধার যে সকল উল্লেখ রহিয়াছে তাহার প্রাচীনতা এবং প্রামাণিকতা আমরা একেবারেই উড়াইয়া দিতে সাহসী না হইলেও এই সকল তথ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে অক্ষম। কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী হইতে রাধার উদ্ভব,—এই মৌলিক সত্যটিকে মানিয়া লইলে ভাগবতপুরাণে যেখানে রাসবর্ণনা উপলক্ষ্যে প্রধানা গোপীর উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানে রাধার উল্লেখ পাইলে আমরা অতি সহজভাবে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। অন্যান্য যে সকল শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদি হইতে রাধার উল্লেখ করা হইয়াছে সে সব গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোন উপায় নাই।

সমস্ত জিনিস পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া। মনে হয়, ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া গানরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চপল আভীর বধূগণ (তুঃ দ্বাদশ শতকে সংগৃহীত সদুক্তিকর্ণামৃতে 'বর্ধমান' কবির পদ—'বৎস ত্বং নব যৌবনোঽসি চপলাঃ প্রায়েণ গোপস্ত্রীয়ঃ' ইত্যাদি।) এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের

of the Salagram stone, of the Tulsi plant and the like. The latest portions are certainly later than the Bhagavatapurana, which belongs to the latest works of Purana Literature'—M. Winternitz : A history of Indian literature (University of Calcutta, 1963) vol 1. pt, II, p. 477. 'This khanda comes undoubtedly from a very late date. The birthday festival of Radha also indicates the late origin of the khanda, there being no mention of the Radha-Cult in the Mahabharata, Ramayana, Harivamsa and the earlier puranas—' R. C. Hazra : Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs. (The University of Dacca Bulletine No XX, 1940), pp 115-116.

'পদ্মপুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করা শক্ত, আনুমানিক ভাবে ষষ্ঠ শতক—এমন কি অষ্টম শতকের কাছাকাছি ধরিয়া লইলেও তৎকালে অন্ততঃ বৈষ্ণবধর্মমতে রাধার এতখানি প্রসার এবং প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রাধা সম্বন্ধে এই সকল উল্লেখ পরবর্তীকালের যোজনা এইরূপ সংশয়কে একেবারে অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না।'—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে (১৩৭০), পৃঃ ১১৩।

বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণ-গুলিতে স্থান পাইয়া কবি-কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপীলীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনী একটি ফল্গুধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতের রাসবর্ণনার ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে। আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সাক্ষ্য মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্কলনে—কিছু কিছু লিপিতে—কিছু অন্যান্য সাহিত্যে (৩য় সং, পৃঃ ১২০-১২১)।

এই উপরিউক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিলে প্রাচীনতার দিক থেকে উল্লেখ্য মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লিখিত ও আর্যা ছন্দে রচিত হালকবির সংকলিত ‘গাহাসত্তসঈ’-তে রাধা নাম প্রথম লভ্য।[৯] কেবল তাই নয়, রাধা ও কৃষ্ণের একত্র উল্লেখও যদি কোন সুপ্রাচীন গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়ে থাকে তাহলে তা এই ‘গাহাসত্তসঈ’।[১০]

৯। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিষ্ণুশর্মা রচিত ‘পঞ্চতন্ত্রম্’ গ্রন্থের ‘মিত্রভেদ’ উপাখ্যানে রাধা নাম পাওয়া যাচ্ছে। বিষ্ণুর ছদ্মবেশধারী কৌলিকের সমাগম প্রার্থনায় রাজকন্যা নিজেকে মানুষী জ্ঞানে এতদনুচিতবলায় কৌলিক বলছে—সুভগে। সত্যমভিহিতং ভবত্যা, কিং তু রাধা নাম্নী মে ভার্য্যা গোপকুলপ্রসূতা প্রথমমাসীৎ, সা ত্বমত্রাবতীর্ণা ; তেনাহম-ত্রায়াতঃ’ (নির্ণয়সাগর প্রেস সং)। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরে এবং ষষ্ঠ শতকের পূর্বে ‘পঞ্চতন্ত্রম্’ রচিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : **S. N. Dasgupta and S. K. De—A History of Sanskrit Literature (University of calcutta, 1962), vol. 1, pp 696-707.**

১০। প্রাকৃত ‘গাহাসত্তসঈ’-র সংস্কৃত পাঠ ধরে একে ‘গাথাসপ্তশতী’ বলা হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিপজিগ থেকে বেবর (Weber) একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে মোট গাথার সংখ্যা একহাজার। ১৮৮৯ সালে নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে দেবনাগরী অক্ষরে গঙ্গাধর ভট্টের টীকা সংযোগে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালে ঐ নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে কেদারনাথ ও বাসুদেব শর্মা একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ সালে আবার ঐ প্রেস থেকে জয়পুরের ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী তাঁর স্বরচিত ‘ব্যঙ্গ্য সবস্কষা’ টীকা যোগে একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে পুনা হতে জোগেলকার কৃত মারাঠী অনুবাদসহ একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালে কলকাতা হতে বঙ্গাক্ষরে বাংলা গদ্যানুবাদসহ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণগুলিতে গাথার সংখ্যা সাতশ। সাতশ গাথার সমষ্টি বলেই নাম গাথাশপ্তসতী। প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে শ্লোকসংখ্যার বিভিন্নতা আছে। তদুপরি লুভারস্ ও জ্যাকোবি দেখিয়েছেন যে, সাতশ গাথার মধ্যে মাত্র ৪৩০টি গাথা হচ্ছে সাধারণ, অর্থাৎ সকল পাণ্ডুলিপিতেই আছে। আর বাকী ২৭০টি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রকম।

মুহমারূএণ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণ বল্লবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি ॥—১।৮৯ (পোট্টিস)

[হে কৃষ্ণ তুমি মুখের ফুঁ দিয়ে রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ (ধূলিকণা) দূর করছ, এতে পুরোবর্তিণী অন্যান্য গোপীদের গৌরব হরণ করছ।]

এই গাথাটিতে যে কেবল রাধা বা রাধাকৃষ্ণ নাম পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, রাধা যে কৃষ্ণের সর্বোত্তম প্রেয়সী তাও সূচিত হচ্ছে। এ গাথাটি ভিন্ন কৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম সম্পর্কিত আরও কয়েকটি গাথা এখানে মিলে। নিম্নে সেগুলি উদ্ধৃত হল—

ণচ্চণসলাহণণিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণগোবী।
সরিসগোঁবিআণ চুম্বই কবোলপডিমাগঅং কণ্‌হ ॥—২।১৪ (গুবর ?)

[পাশে দাঁড়ানো নিপুণ গোপী নৃত্যশ্লাঘাচ্ছলে সমান (অনুরাগসম্পন্না) গোপীদের গণ্ডস্থলে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণরূপ চুম্বন করছে।]

অজ্জ বি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।
কণ্‌হমুহপেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅ-বহূহি ॥—২।১২ (বিধিবিগ্রহ)

[আজ পর্যন্তও দামোদর আমার নিকট শিশু রয়ে গেছে—যশোদা এ কথা বলাতে কৃষ্ণের মুখপানে চোখ-ঠেরে ব্রজবধূরা গোপনভাবে হাসল।]

পরবর্তীকালে পদাবলী সাহিত্যে বাৎসল্য রসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার বীজরূপ এখানে নিহিত বলা চলে।[১১]

ভিণ্টারনিৎজ প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে সাতবাহন বংশীয় রাজা হাল আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং গাহাসত্তসঈ ঐ সময়ে সংকলিত হয়েছিল।[১২] কীথ প্রমুখ পণ্ডিতেরা গাথাগুলির ভাষা বিচারে একে এতটা প্রাচীন

১১। 'পূতনাবধ, শকট ভঞ্জন, গোবর্ধন ধারণ' ইত্যাদি কৃষ্ণের শিশুলীলা প্রথমে ছিল অদ্ভুত রসের ব্যাপার। সাহিত্যের চেয়ে শিল্পেই এ সব লীলার স্ফূর্তি তখন ছিল বেশী, পূতনাবধে বাৎসল্যরস কিঞ্চিৎ ছিল বটে, কিন্তু সে অবান্তর। কৃষ্ণের কৈশোরলীলায় বাৎসল্যরসের বিস্তার হতে লাগল, কিন্তু তা সর্বদাই অদ্ভুত বা আদি-রসের তলায় তলায় বয়ে এসেছে, যেমন প্রাকৃত গাথায়—'অজ্জ বি বালো দামোঅরো ত্তি' ইত্যাদি।—

ডঃ সুকুমার সেন ঃ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত 'বলরাম দাসের পদাবলীর ভূমিকা', পৃঃ ১৮।

১২। M. Winternitz : A History of Indian Literature (Translated from the German with additions by Subhadra Jha, 1963), vol. III, pt. I. pp. 108-115.

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত সাতবাহন নরপতি হালের গাথাসপ্তশতী (১৩৬২) ভূমিকা, পৃঃ ।৶০।

স্বীকার করেন না। কীথের মতে এটি খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি কালের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল।[১৩] জার্মাণ পণ্ডিত বেবরের মতে এর সংকলন কাল খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক।[১৪] ডঃ সুকুমার সেনের মতে, সংকলনটি এককালে ঘটে নি। ৪০০ হতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এর শ্লোকসংগ্রহ পূর্ণতা লাভ করেছিল।[১৫]

গাহাসত্তসঈতে পবরসেণস্‌স বা প্রবরসেনের কয়েকটি গাথা পাওয়া যায়।[১৬] এই প্রবরসেন 'রাবণবহো' প্রণেতা হলে হাল কবি খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী হন। কারণ পণ্ডিতদের মতে প্রবরসেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন।[১৭] খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই যে হালকবি বর্তমান ছিলেন এবং গাহাসত্তসঈ সংকলিত হয়েছিল, এমনটি কেউ কেউ খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের কবি বাণভট্টের উল্লেখ থেকে অনুমান করেন। বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে সাতবাহনকুলের কোন এক রাজার রচিত বা সংগৃহীত এক কোষ-গ্রন্থের এবংরূপ প্রশংসা করেছেন—

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥—১ম উচ্ছ্বাস, ১৩শ শ্লোক

[লোকে যেমন বিশুদ্ধজাতি রত্ন দ্বারা কোষ গড়ে, সাতবাহন রাজাও তেমনি সুভাষিতের দ্বারা অবিনাশী ও অগ্রাম্য কোষ রচনা করেছিলেন।]

এই সাতবাহন ও তাঁর সংকলিত কোষগ্রন্থ রাজা হাল ও 'গাহাসত্তসঈ'কে উদ্দিষ্ট করেছে, পণ্ডিতদের ধারণা।[১৮]

এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতি শতকের শেষ গাথাটিতে 'সিরিহাল' (শ্রীহাল), 'কই বচ্ছল' (কবি বৎসল) প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু নরপতি হাল বলে কোথাও

১৩। A. B. Keith – A History of Sanskrit Literature (Oxford University Press, 1961), p 222-224. কীথ অনুমান করেন যে, প্রথমে খুব সম্ভব একমাত্র হালেরই রচনার সংকলন ছিল, পরে তাতে অন্যান্য কবির কবিতা সংযোজিত হয়ে বহু কবির রচিত সপ্তশত গাথার একটি কোষগ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়।

১৪। M. Winternitz— ঐ, p. 115. fn. I.

১৫। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৮), পৃঃ ৪০৮।

১৬। গাথাসপ্তশতী ১।৬৪ ; ৩।২, ৮ ও ১৬।

১৭। ডঃ সুশীলকুমার দের মতে প্রবরসেন খ্রীস্টীয় ৫ম শতকে বর্তমান ছিলেন। দ্রষ্টব্য : History of Sanskrit Literature (1947), p. 119. ভিন্টারনিৎজের মতে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবরসেন বর্তমান ছিলেন। দ্রষ্টব্য : A History of Indian Literature (1963), vol. II, p. 50

১৮। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত সাতবাহন নরপতি হালের 'গাথা সপ্তশতী'র া, পৃঃ ।৶০।

ভণিতা নেই। 'গাহাসত্তসঈ'র একটি দ্ব্যর্থবোধক গাথাতে (৫।৬৭) আপন্নকুলের উন্নতি-বিধায়ক এক সাতবাহন বা শালিবাহন বংশীয় রাজার ('সালাহণ-ণরিন্দো') প্রশস্তি আছে বটে, কিন্তু তাঁর নাম যে হাল ছিল কিংবা তিনিই 'গাহাসত্তসঈ'র সংকলয়িতা এমন উল্লেখ নেই। সাতবাহন বংশের এক রাজার নাম হাল ছিল এ কথা সত্য হলেও তিনি এবং গাথা রচয়িতা কবি বৎসল হাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তাও বিশেষ ভাবে বিচার্য। তদুপরি, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে শ্রীপালিত নামে এক কবি হালের অনুগৃহীত ছিলেন। তিনিই গাথাগুলিকে সংগ্রহ করে হালের নামে উৎসর্গ করেন। বস্তুতঃ, হালের পরিচয়, আবির্ভাবকাল ইত্যাদি খুবই বিতর্কিত ব্যাপার। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে এ বিষয়ের সমাধানের অবসর নেই। মোটামুটিভাবে 'গাহাসত্তসঈ' যাঁরই সংকলিত হোক এবং যে সময়েই এই সংকলন বর্তমান আকার পেয়ে থাক মূলে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সংকলন গ্রন্থ ছিল সন্দেহ নেই।

এতাবৎ আলোচনা থেকে আমরা এই অনুমান করতে পারি যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই কাব্যে গাথায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল নতুবা এই কোষগ্রন্থে ১।৮৯ গাথায় রাধাকৃষ্ণলীলার পরিচয় পাওয়া যেত না। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে, এই গাথাটি প্রক্ষিপ্ত, কারণ তাঁদের মতে রাধার অস্তিত্ব এত প্রাচীন কালে থাকতে পারে না। কিন্তু গাথাটি সঙ্কলনের প্রথম শতকেই স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া কৃষ্ণ-গোপী প্রেম সম্পর্কিত আরও কয়েকটি গাথা এই সঙ্কলনে পাওয়া যায়, পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং গাথাটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার তেমন কোন সঙ্গত কারণ নেই। 'গাহাসত্তসঈ'র মধুর রসাত্মক গাথাগুলির ভাবের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সমৃদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবের অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য বিস্ময়কর ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'গাহাসত্তসঈ'তে পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, আক্ষেপানুরাগ, মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ও প্রোষিতভর্তৃকা ইত্যাদির বর্ণনামূলক যে সব গাথা আছে, তাদের ভাবের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ বর্ণনামূলক পদের ভাবের নৈকট্য আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা যাবে।

মানবমানবীর প্রেম গূঢ় অনুভূতির অপূর্ব প্রকাশ এই গাথাগুলি। ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও এদের মধ্যে রয়েছে সেই শিশিরবিন্দুতে প্রতিফলিত সূর্যের মত অনুভবের বিস্তারিত মহিমা। ভাব প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যে এগুলি এক একটি নিটোল মুক্তাফল। প্রতিটি গাথাই নিজের দীপ্তিতে ভাস্বর, স্বয়ং পূর্ণতায় সমৃদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলীও তাই। বৈষ্ণব পদাবলীর অকৃত্রিম ভাবগভীরতার সঙ্গে এই গাথাগুলির ভাবগভীরতা তুলনীয়। প্রেমের বাধাবন্ধহারা দুর্মর আবেগ ও গতি, বলিষ্ঠতা ও তন্ময়তা উভয়ত্রই লক্ষণীয়। ছলাকলা, হাবভাব, বিলাসবিভ্রম, হাসিকান্না, আনন্দবেদনা, মিলনবিরহ—এই শত তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত প্রেমের বিচিত্ররূপ, উভয়ক্ষেত্রেই সহজদৃষ্ট। বস্তুতঃ, রাধাকৃষ্ণ এই নামাবলী চিহ্নিত বলেই বৈষ্ণব পদাবলীর পৃথক অস্তিত্ব প্রতীত। নতুবা এই রাধাকৃষ্ণ নাম দুটি মুছে দিলে পদগুলি নিখিল মানব-মানবীর রাগদীপ্ত প্রেমের মিলন বিরহ বেদনার চিরন্তন আলেখ্য হয়েই দাঁড়াবে। এ

কারণেই অনুমান, 'গাহাসত্তসঈ'র ভাবপ্রতিমার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবপ্রতিমার এমন নিবিড় সাজাত্য লক্ষ্যগোচর। দ্বিতীয়তঃ, ধারণা যে, 'গাহাসত্তসঈ'র গাথাগুলির সঙ্গেও বাংলাদেশের রাধাকৃষ্ণলীলার কবিরা পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁদের পদে গাথার ভাবচিত্র ও কল্পনা কখনও আংশিক, কখনও পূর্ণছায়া সম্পাত করেছে। দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে 'গাহাসত্তসঈ'র কাব্যপ্রসিদ্ধি যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার উজ্জ্বল প্রমাণ গোবর্ধনাচার্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী', গোবর্ধনাচার্য হালের 'গাহাসত্তসঈ' থেকে 'আর্য্যাসপ্তশতী' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা স্বীকার করেছেন। তাঁর গ্রন্থের আর্য্যাসপ্তশতী নামকরণ হালের 'গাহাসত্তসঈ' নামের অনুকরণে দেওয়া। কেবল নামকরণেই নয়, ভাবে ও ভঙ্গীতেও তিনি হালকবিকে বহুল অনুকরণ করেছিলেন। 'গাহাসত্তসঈ'র গাথাগুলির সঙ্গে আর্য্যা সপ্তশতীর শ্লোকগুলির ভাবসাদৃশ্য প্রচুর। 'গাহাসত্তসঈ'র—

তং ণ মহ জস্স বচ্ছে লচ্ছিমুহং কোত্থহম্মি সংকন্তং।
দীসই মঅ-পরিহীণং সসি-বিম্বং সূর-বিম্ব ব্ব॥ - ২।৫১ (নিষ্কলঙ্ক)

[সেই (নারায়ণকে) প্রণাম কর—যাঁর বুকের কৌস্তুভমণিতে সংক্রান্ত লক্ষ্মীদেবীর মুখখানি, সূর্যবিম্বে প্রতিফলিত মৃগশূন্য (অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক) চাঁদের বিম্বের মত, শোভমান দেখা যায়।]

এই গাথাটির সঙ্গে আর্য্যা সপ্তশতীর এই শ্লোকটির সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্যণীয়—

প্রতিবিম্বিতপ্রিয়াতনুসকৌস্তুভং জয়তি মধুভিদো বক্ষঃ।
পুরুষায়িতমভ্যস্যতি লক্ষ্মীর্যদ্বীক্ষ্য মুকুরমিব॥[১৯]

[সেই মধুহন্তা যাঁর বুকের কৌস্তুভমণিতে প্রিয়ার দেহ বিম্বিত হচ্ছে, তাঁর জয় হোক। মণিটিকে দর্পণস্বরূপ ব্যবহার করে লক্ষ্মী পুরুষায়িত অভ্যাস করছেন।]

জাইং বঅণাইং অম্হে বি জম্পিও তাইঁ জম্পই জণো বি।
তাইং চিঅ তেণ পজম্পিআইং হিঅঅং সুহাবেন্তি॥—৭।৪৯ (অজ্ঞাত)

[যে কথা আমরা বলে থাকি, অন্য লোকেরাও তাই বলে, কিন্তু প্রিয়তম দ্বারা সেই কথাগুলি উক্ত হলে হৃদয়ে সুখ উৎপাদন করে।]

উপরোক্ত গাথাটিরই ভাবধ্বনির আশ্রয়ে আর্য্যা সপ্তশতীর নিম্নোক্ত শ্লোকটি লিখিত বললে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হবে না—

অন্যমুখে দুর্বাদো যঃ প্রিয়বদনে স এব পরিহাসঃ।
ইতরেন্ধনজন্মা যো ধূমঃ সোঽগুরুভবো ধূপঃ॥—১৩

[অন্য লোকের মুখে যা দুর্বাক্য, তাই প্রিয়জনের মুখে পরিহাস তুল্য। ইন্ধনান্তর থেকে উদ্ভূত হলে যাকে ধূম বলা হয়, অগুরু থেকে উদ্ভূত হলে তাই ধূপ।]

১৯। আর্য্যা সপ্তশতী, উপক্রমণিকা, ১২শ শ্লোক। (কাশীমিত্র সং ১৯৩১) অনুসারে শ্লোকসংখ্যা ও পাঠ দেওয়া হয়েছে।

পোট্টং ভরন্তি সউণা বি মাউআ অপ্পণো অণুব্বিগ্‌গা।
বিহলুদ্ধরণ-সহাবা হুবন্তি জই কে বি সপ্পুরিসা ॥ –৩।৮৫ (আর্কল)

[হে মাতৃগণ, পাখীরা অনুদ্বেগে নিজের পেট ভরিয়ে থাকে, (কিন্তু) কেউ যদি সৎপুরুষ হয়, তবে তাদের স্বভাব দুর্গত জনের উদ্ধারে নিযুক্ত হয়।]

এই গাথাটির সঙ্গে তুলনীয়—

কৃচ্ছ্রাত্মবৃত্তয়োঽপি হি পরোপকারং ত্যজন্তি ন মহান্তঃ।
তৃণমাত্রজীবনা অপি করিণো দানদ্রবার্দ্রকরাঃ ॥—১৭৪

[কষ্টে থাকলেও মহাপুরুষেরা পরোপকার ত্যাগ করেন না। তৃণমাত্রভোজী হলেও হাতীর শুঁড় দানবারিসিক্ত হয়।]

উব্বহই ণব-তণঙ্কুর-রোমঞ্চ-পসাহিআইঁ অঙ্গাইং।
পাউস-লচ্ছীঅ পওহরেহিঁ পরিপেল্লিও বিঞ্ঝো ॥—৬।৭৭ (অজ্ঞাত)

[বর্ষালক্ষ্মীর মেঘদর্শনে বিন্ধ্যপর্ব্বত নবতৃণাঙ্কুররূপ রোমাঞ্চ দ্বারা প্রসাধিত অঙ্গ ধারণ করছে।]

গাথার এই বর্ষাবর্ণনার সঙ্গে কিছু পরিমাণে মিলে আর্য্যাসপ্তশতীর নিম্নোক্ত বর্ষাবর্ণনা—

সর্বং বনং তৃণাল্যাঃ পিহিতাঃ শীতাংশুরবিতারাঃ।
প্রধ্বস্তাঃ পন্থানো মলিনেনোহ্‌ন্য মেঘেন ॥—৬৬৯

[কালো মেঘের আবির্ভাবে সমস্ত বন তৃণে সমাচ্ছন্ন, চন্দ্রসূর্যতারা ঢেকে গেছে। পথের রেখাও নিশ্চিহ্ন।]

তালূর-ভমাউল-খুডিঅ-কেসরো গিরি-ণঈএ পূরেণ।
দর-বুড্ড-উবুড্ড-ণিবুড্ড-মহুঅরো হীরই কলম্বো ॥—১।৩৭ (অবটঙ্ক)

[গিরিনদীর জলপ্রবাহে কদম্বগাছটি ভেসে যাচ্ছে, কেশরসমূহ জলের ঘূর্ণিতে ছিন্ন হচ্ছে আর ভ্রমরেরা কদাচিৎ ঈষৎ মগ্ন, উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হচ্ছে।]

উপরোক্ত গাথার ঠিক অনুরূপ বর্ণনার পরিচয় আর্য্যাসপ্তসতীতে মিলে—

হৃত্বা তটিনি তরঙ্গৈর্ভ্রমিতশ্চক্রেষু নাশয়ে নিহিতঃ।
ফলদলবল্কলরহিতস্ত্বয়াস্তরিক্ষে তরুস্ত্যক্তঃ ॥—৬৯৩

[প্রবল তরঙ্গ ও আবর্ত্ত তীরস্থিত বৃক্ষগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।]

ণুমেন্তি জে পহুত্তং কুবিঅং দাসা ব্ব জে পসাঅন্তি।
তে ব্বিঅ মহিলানঁ পিআ সেসা সামি ব্বিঅ বরাআ ॥

—১।৯১ (মাধবী)

[যে পুরুষেরা নিজ প্রভুত্ব গোপন রাখে এবং যারা দাসের ন্যায় ক্রুদ্ধা কান্তাকে প্রসন্ন রাখে তারাই মহিলাদের প্রিয়। আর তাছাড়া পুরুষেরা শোচ্য স্বামীশব্দে আখ্যাত হয় (অর্থাৎ প্রিয় হয় না)।]

গাথাটির ভাবছায়া নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্যণীয়—

নাথেতি পুরুষমুচিতং প্রিয়েতিদাসত্যেনুগ্রহো যত্র।
তদ্দাম্পত্যমতোন্যন্নারী রজ্জুঃ পশুঃ পুরুষঃ ॥—৩৩৭

[যেখানে নাথ সম্বোধন কঠোর বলে গণ্য, প্রিয় সম্বোধনই যোগ্য সম্বোধন, যেখানে 'আমি দাস' এই বলে পতি অনুগ্রহ দেখায়, তাই দাম্পত্য। এ ছাড়া নারী রজ্জু আর পুরুষ পশু।

বিরহাণলো সহিজ্জই আসা-বন্ধেণ বল্লহ-জণস্স।
এক-গ্গাম-পবাসো মাত্র মরণং বিসেসেই ॥—১।৪৩ (অম্বত)

[প্রিয়জনের (দূর প্রবাসের জন্য) বিরহ আশাবন্ধনবশতঃ সহ্য করা যায়, কিন্তু হে মাতা, এক গ্রামে থেকেও যদি প্রবাস ঘটে, তবে তা মরণকেও অতিক্রম করে।]

এই গাথাটির ভাববিম্ব নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে সংলক্ষ্য—

অনয়নপথে প্রিয়ে ন ব্যথা যথা দৃশ্যং এব দুষ্প্রাপে।
ম্লানৈব কেবলং নিশি তপনশিলা বাসরে জ্বলতি ॥—২৬

[যতদিন প্রবাসে ছিলে ততটা দুঃখ ছিল না। এখন কাছে থেকেও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দুঃখ, সূর্যের অভাবে সূর্যকান্তমণি আজ নিশিবাসরে ম্লান।]

চিরডিং পিঅআনন্তো লোআ লোএহিঁ গোরববভহিআ।
সোণারতুলে ব্ব নিরক্খরা বি খন্ধেহিঁ উব্ভন্তি ॥—২।৯১ (পাবচ্ছীল)

[লেখাপড়ার চর্মবিহীন ও বর্ণমালার জ্ঞানরহিত লোককেও গৌরবে অধিক মনে করে সময়বিশেষে কাঁধে তুলে বয়ে বেড়ায়।]

ঠিক অনুরূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এই আর্যাটিতে—

অবুধা অজঙ্গমা অপি কয়াপি পত্যা পরং পদমবাপ্তাঃ।
মন্ত্রিণ ইতি কীর্ত্যন্তে নয়বলবটিকা বৈ জনেন ॥—৪১

[ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ চালনাগুণে দাবার গুটির মত অবোধ, জড় ব্যক্তিরাও উৎকৃষ্ট পদ পায় এবং মন্ত্রিরূপে খ্যাতি লাভ করে।]

'গাহাসত্তসঈ'র প্রারম্ভ গাথা ও উপান্ত্য গাথাটির ভাবপ্রেরণায় যে আর্য্যা সপ্তশতীর উপক্রমণিকায় এই শ্লোকটি লেখা তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

প্রতিবিম্বিত গৌরীমুখবিলোকনোৎকম্পশিথিলকরগলিতঃ।
স্বেদভরপূর্য্যমাণঃসম্ভোঃশরীলাতুর্লিজয়তি ॥—৭

[গৌরীর মুখ প্রতিবিম্বিত দেখে কম্পিত এবং তজ্জনিত শিথিলতাবশতঃ হাত থেকে গলিত সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ শম্ভুর সলিল অঞ্জলি জয়লাভ করে।]

গাথা দুটির হরবন্দনা অনুরূপই—

পসুবইণো রোসারুণ-পডিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহঅন্দং।
গহিঅগ্ঘ-পঙ্কঅং বিঅ সংঝা সলিলঞ্জলিং ণমহ ॥—১।১ (হাল)

[পশুপতির সন্ধ্যার সলিলাঞ্জলিকে নমস্কার কর, যাতে গৌরীর রোষারুণ মুখ বিস্মিত হয়েছে এবং (সে জন্য) যাতে অর্ঘ্যপদ্ম গৃহীত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।]

সংঝা-গহিঅ জলঞ্জলি-পডিমা সংকন্ত-গোরি-মুহ-কমলং।

অলিঅং চিঅ ফুরিওট্ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং ণমহ ॥—৭।১০০ (অজ্ঞাত)

[সন্ধ্যাসময়ে গৃহীত জলাঞ্জলিতে বিম্বিত গৌরীমুখ দেখে মন্ত্রোচ্চারণ লুপ্ত হলেও মিথ্যা ওষ্ঠস্ফুরণকারী হরকে নমস্কার কর।]

এ রকম বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।[২০] বস্তুতঃ আর্য্যাসপ্তশতী যে 'গাহা-সত্তসঈ'র অনুপ্রেরণায় লেখা এ কথা গোবর্ধনাচার্যের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

বাণীপ্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।

নিম্নানুরূপতীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলম্ ॥[২১]

[প্রাকৃত ভাষার সমুচিতরস যে বাণী, এখানে তা বলপূর্বক সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন নিম্নতীরা মর্ত্যবাহিনী কলিন্দকন্যা বলরাম কর্তৃক গগনতলে নীত হয়েছিল।]

ব্যঙ্গ্যার্থ এই যে, হালের প্রাকৃতগাথা ও আর্য্যাসমূহের পার্থক্য—মলিনপ্রবাহা কালিন্দীর সঙ্গে আকাশে প্রবাহিতা স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনীর যতখানি পার্থক্য ঠিক ততখানি।[২২] গোবর্ধনাচার্য ইঙ্গিতে তাঁর কাব্যসম্পর্কে যতই প্রশংসা করুন না কেন, স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে আর্য্যাসপ্তশতী 'গাহাসত্তসঈ'-র তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ মনে হবে। স্বতঃস্ফূর্ত অবারিত কবিত্বের পরিচয় গাথাগুলিতে যেখানে সহজলভ্য, সেখানে আর্য্যাগুলিতে তা একান্ত বিরল। উপরিপ্রদত্ত তুলনামূলক আলোচনা পাঠে সহৃদয়েরা এটা অনুভব করবেন। গোবর্ধনাচার্যের সমসাময়িক মধুরকোমলকান্ত পদাবলীসমৃদ্ধ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবও হালকবির 'গাহাসত্তসঈ'-র সঙ্গে যে ভালভাবে পরিচিত

২০। তুলনীয়—গাথা ১।২৩, ২৭, ৩১, ৩৩, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫২,৬২, ৬৩, ৬৬ ও ৮৪র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ৫১৪, ৩২৮, ৫১৭, ১৫৩, ৩৩৮, ৪৩৩, ২৪১, ৫৩০, ৯৩, ৩২৩, ১০৬ ও ৩৮১; গাথা ২।২৫, ২৬, ৩৭, ৪২, ৮০, ৮২ ও ৯৪-র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ৩২০, ৪৮১, ৩৪৮, ৩৩৫, ১৯১, ৩৭৫ ও ৪৬; গাথা ৩।৮, ২০ ও ৩৭-র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ২৬১, ৫৪৫ ও ১৯৭; গাথা ৪।১র সঙ্গে আর্য্যা ৫৬৯; গাথা ৫।১, ২৭ ও ৩০র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ৩৭৮, ৪৩৯ ও ৫৯১; গাথা ৬।৫৫, ৯৪ ও ১০০র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ৪০৫ ২৮৪ ও ৪১৬; গাথা ৭।৫৩, ৬৫ ও ৭৬র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ৩৯৪, ৬৫৬ ও ২৫২ ইত্যাদি।

২১। আর্য্যাসপ্তশতী, উপক্রমণিকা, ৫২শ শ্লোক।

২২। 'এবং চ প্রাকৃতসংস্কৃতয়োর্ভূতলগগনতলতুল্যতাপ্রতিপাদনেন প্রাকৃতাৎ সংস্কৃতেঽত্যন্তাধিক্যমাবেদ্যতে'।—অনন্ত পণ্ডিতকৃত ব্যঙ্গ্যার্থদীপনা টীকা। আর্য্যাসপ্তশতী (নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা সং), পৃ. ১৯।

ছিলেন, তা নিম্ন আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে। গীতগোবিন্দের কবি লৌকিক নরনারীর প্রেমগাথাকে সুনিপুণভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সংস্থাপিত করেছেন। জয়দেবের কবিপ্রতিভা বহুস্থলে গাথাকারদের ভাবসম্পদকে ঋণস্বরূপে গ্রহণ করেছে। তবে তাকে এমনভাবে আত্মসাৎ করে ধ্বনিমধুর শব্দরাজির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তা আর সহসা ঋণ বলে প্রতিভাত হয় না। সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণে এই ঋণ গ্রহণ আমাদের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়বে।

অরণ্যে বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। চঞ্চল মধুকরের গুঞ্জরণে অরণ্যভূমি মুখরিত। বিরহিণী নারী বেদনার্ত হৃদয়ে গেয়ে চলেছে বিরহের গান—

মহু-মাস-মারুআহঅ—মহুঅর-ঝংকার-নিব্ভরে রণ্ণে।
গাঅই বিরহক্খরাবদ্ধ-পহিঅ-মণ-মোহণং গোবী ॥—২।২৮ (শালিক)

[মধুমাসের বাতাসে আহত হয়ে ভ্রমরেরা ঝংকারে বন ভরে তুলছে, গোপীও বিরহাক্ষরযুক্ত পদ দ্বারা পথিকজনের মন মোহিত করে গান করছে।]

গাথার এই বর্ণনার আশ্রয়ে জয়দেব বসন্তে চঞ্চলিত প্রকৃতির নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন মনে হয়।

উন্মদ মদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুলবকুলকলাপে ॥—গীতগোবিন্দ ১।২৯

[পথিক বধূরা উদ্দাম মদনভরে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করছে। বকুল তরু ফুলে পূর্ণ। ভ্রমরেরা ফুলগুলিতে ব্যাপ্ত হয়ে একান্ত আকুল করে তুলছে।]

অসমত্ত-গুরুঅ-কজ্জে এণ্হিং পহিএ ঘরং ণিঅত্তন্তে।
ণব-পাউসো পিউচ্ছা হসই ব কুডঅট্ট-হাসেহিং ॥—৬।৩৭ (অজ্ঞাত)

[হে পিসী, সম্প্রতি প্রয়োজনীয় কাজ ফেলে পথিক গৃহে ফিরে এলে পর নতুন বর্ষা কুটজপুষ্পবিকাশরূপে অট্টহাসি হাসছে।]

উপরোক্ত গাথাটির সঙ্গে সহজে তুলনা করা যায় গীতগোবিন্দের এই অংশটি—

বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকন তরুণকরুণকৃতহাসে।—গীত ১।৩২

[(এই বসন্তে) জগতকে লজ্জাহীন দেখে নবপুষ্পিত বাতাবী গাছগুলি (যেন পুষ্পচ্ছলে) হাসছে।]

একটি গাথাতে নায়িকার বিগত দিনের প্রণয়লীলাতে আকৃষ্টচিত্ততার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়—

সচ্চং ভণামি মরণে ট্ঠিঅমহিপুণ্ণে তডম্মি তাবীএ।
অজ্জ বি তত্থ কুডঙ্গে ণিবডই দিট্ঠী তহ চ্চেঅ ॥—৩।৩৯ (বিদগ্ধ)

[সত্যই বলছি, মৃত্যুপথে সন্নিহিত হয়েছি বটে, (কিন্তু) আজও তাপীনদীর পুণ্যতটস্থিত নিকুঞ্জেই আমার দৃষ্টি তেমনভাবেই রয়েছে।]

রাধাও সখীর কাছে যে মনোবেদনা প্রকাশ করেছে, তাতেও বিগতদিনের প্রণয়লীলার প্রতি গূঢ় আকর্ষণের কথা এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে—

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥—গীত ২।২

[সখি, যাঁর সুধাময় অধরফুৎকারে মোহনবাঁশী বেজে উঠছে, কটাক্ষবিক্ষেপে মুকুট চঞ্চল হচ্ছে এবং কুণ্ডল কপোলে দুলছে, সেই হরি আজ আমাকে ছেড়ে বিলাসে রত। আমার মন কিন্তু সেই (পূর্ব) রাসক্রীড়ার কথাই স্মরণ করছে।]

নায়কের অপরাধসত্ত্বেও নায়ক প্রতি নায়িকার অবিচল অনুরাগ একটি গাথাতে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

অবরজ্ঝসু বীসদ্ধং সব্বংতে সুহঅ বিসহিমো অম্হে।
গুণ-নিব্ভরম্মি হিঅএ পত্তিঅ দোসা ন মাঅন্তি ॥—৪।৭৬ (মাতৃরাজ)

[হে সুভগ, বিস্রব্ধভাবে যত পার, অপরাধ কর। আমি তোমার সব সইব। তুমি বিশ্বাস কর, তোমার গুণপূর্ণ আমার হৃদয়ে তোমার দোষসমূহ স্থান পাবে না।]

জয়দেবের রাধার কণ্ঠেও অনুরূপ বাণী ধ্বনিত হতে দেখি—

গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতীষু বলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥—গীতা ২।১০

[কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে অন্য যুবতীদের নিয়ে বিহার করছে, সখি তথাপি আমি তাকে কামনা করছি। মন ভুলেও ক্রোধকে স্থান দিচ্ছে না। উপরন্তু তার গুণ গণনা করছে। হৃদয় দোষসমূহকে পরিহার করে তার স্মরণেই সুখলাভ করছে। মন বশীভূত নয়, আমি কি করব ?]

এ সব ক্ষেত্রে গাথারই সূক্ষ্ম ভাববীজ জয়দেবের কবিপ্রতিভার জলসেকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয়ে মহিমসুন্দর কাব্যরূপ পেয়েছে, বিশ্বাস।

জাও সো বিলক্খো মএ বি হসিউণ গাঢ়মুবগূঢ়ো।
পঢ়মোসরিঅস্স ণিঅংসণস্স গন্ঠিং বিমগ্গন্তো ॥—৪।৫১ (চন্দ্র)*

[প্রথমেই বিগলিত (আমার) বসনের গ্রন্থি খোঁজে উদ্যত হয়ে সেও লজ্জিত হয়ে পড়ল, আমিও হেসে তাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলাম।]

উপরোক্ত গাথাটির নায়িকার প্রথম সমাগমের স্মৃতির সঙ্গে রাধার প্রথম সমাগমের স্মৃতিচিত্রের ক্ষীণগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।

মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥—গীত ২।১২

[প্রথম মিলনকালে লজ্জিতা দেখে যে পটুতার সঙ্গে অনুকূল শত চাটুবাক্য বলেছিল এবং মৃদুমধুর হাসিতে আলাপ করতে দেখে জঘনবসনশিথিল করেছিল।]

একটি গাথাতে কেশাকর্ষণপূর্বক অধরচুম্বনের রীতি দেখতে পাওয়া যায়—

চন্দ-সরিসং মুহং সে সরিসো অমঅস্স মুহ-রসোত্তিস্সা।

সকঅ-গ্‌গহ-রহসুজ্জল-চুম্বণঅং কস্স সরিসং সে ॥—৩।১৩ (বাহবরাজ)

[মুখ চাঁদের মত, অধররস অমৃততুল্য (কিন্তু) কেশগ্রহণসহকারে চুম্বন কোন বস্তুর তুল্য।)

জয়দেবও কেশাকর্ষণপূর্বক চুম্বনের কথা বলেছেন—

চরণরণিতমণিনূপুরয়াপরিপূরিতসুরতবিতানম্।

মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥—গীত ২।১৬

[আমার পায়ের নূপুর বাজতে থাকলে যার সুরতবিতান পূর্ণ হত, আমার মুখর মেখলা অবিন্যস্ত হলে কেশাকর্ষণপূর্বক চুম্বন করতেন।]

গাথাকারের ভাষাটিও পর্যন্ত জয়দেব গ্রহণ করেছেন—'সকঅ-গ্‌গহ-রহসুজ্জল-চুম্বণঅং' এরই সংস্কৃত পাঠ 'সকচগ্রহচুম্বনদানম্' বলা চলে।

অন্যত্রও এই কেশাকর্ষণপূর্বক চুম্বনের কথা আছে—

হস্তেনানুমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ।—গীত ১২।১১

প্রিয়জনবিরহে অশোকলতা দ্বারা রমণীদের তাপিত হবার কথা একটি গাথা থেকে জানতে পারা যায়—

তাবিজ্জন্তি অসোএহিঁ লডহ-বণিআঁও দইঅ বিরহম্মি।—১।৭

[প্রিয়জনবিরহে বিদগ্ধ বণিতারাও অশোকলতা দ্বারা তাপিত হয়।]

রাধাও বিরহে অশোকলতিকার দ্বারা পীড়িত হয়েছে দেখতে পাই—

দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা—গীত ২।২০

[ঈষদ্বিকশিত নতুন অশোকলতা আমার চোখকে পীড়া দিচ্ছে।]

রমণীর সুচতুরলীলাবিভ্রমের সুন্দর স্বাক্ষর একটি গাথাতে রয়েছে—

মালারী ললিউল্লুলিঅ-বাহু-মূলেহিঁ তরুণ-হিঅআইং।

উল্লুরই সজ্জুল্লুরিআই কুসুমাইঁ দাবেন্তী ॥—৬।৯৬ (অজ্ঞাত)

[মালিনী সদ্যঃ ছিন্ন কুসুম দেখাতে গিয়ে তার সুন্দর ও বিশাল স্তন দ্বারা যুবকদের হৃদয় ব্যাকুল করে তুলছে।]

স্তনমণ্ডলকে প্রদর্শন করানোর একটি সচেতন অভিপ্রায় মালিনীর আচরণে গূঢ় রয়েছে মনে করি।

গোপীরাও কৃষ্ণকে এমনভাবে কামনাকুল করতে চেয়েছে—

সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত।

ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্ ॥—গীত ২।২১

[গোপীরা আকুতিব্যঞ্জক হাসি, উল্লসিত কটাক্ষভঙ্গী করছে, কেশপাশবন্ধনে ব্যগ্র হয়ে পীনকুচার্দ্ধভাগ প্রদর্শন ছলে বাহুমূল থেকে বসন দূর করছে।]

গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের দ্বিতীয় শ্লোক 'ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ' ইত্যাদি গাথার ভাবপ্রেরণায় লেখা এ কথা স্পষ্ট করে বলা না গেলেও 'অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ' অংশটুকু 'গাহাসত্তসঈ'-র একটি গাথার 'মঅণ-সরাহঅ হিঅঅ-ব্বণ' অংশের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। পুরো গাথাটি এই—

অজ্জ সহি কেণ গোসে কং পি মণে বল্লভ' ভরন্তেণ।

অম্হং মঅণ-সরাহঅ হিঅঅ ব্বণফোডণং গীঅং ॥—৪।৮১ (কেশব)

[হে সখি, মনে হয় আজ প্রাতে কে যেন প্রিয়তমাকে স্মরণ করে এ ভাবে গাইছে, যাতে আমাদের মদনবাণদ্বারা আহত হৃদয়ের ব্রণ ফেটে যাচ্ছে।]

লজ্জাবিভ্রমজড়িত প্রিয়ার মুখখানি স্মরণ করছে নায়ক। আকুলিত কুন্তল যেন ভ্রমর, ঘূর্ণিত আনন বায়ুভরে আন্দোলিত পূর্ণ শতদল।

ভরিমো সে গহিআহর-ধুঅ-সীস-পহোলিরালআউলিঅং

বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরালি-পইণ্ণ-কমলং ব ॥—১।৭৮ (মুক্তাধর)

[(চুম্বনার্থ) অধর গৃহীত হলে মাথা ও চুল ঘুরিয়ে আকুলিত তার মুখখানি মনে করছি, মধুলোভে তরলিত ভ্রমরবেষ্টিত পদ্মের মত দেখাচ্ছিল।]

ঠিক অনুরূপভাবে কৃষ্ণও স্মরণ করছে রাধাকে। ভাব ও ভাষায় হুবহুই মিল।

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূ কোপভরেণ।

শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥—গীত ৩।৫

[আমি তাঁর কোপকুটিল ভ্রূলতাযুক্ত মুখমণ্ডল মনে করছি। মনে হচ্ছে, রক্তপদ্মের উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রতীক্ষাকারী নায়কের নিকট নায়িকা তার বিলম্বজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এমনটি আর কখনও হবে না কাতর মিনতি জানাচ্ছে।

অলিঅ-প্রসুত্তঅ বিণীমীলিঅচ্ছ দে সুহঅ মজ্ঝ ওআসং।

গণ্ড-পরিউম্বণাপুলই অঙ্গ ণ পুণো চিরাইস্সং ॥—১।২০ (চন্দ্রস্বামী)

[হে সুভগ, মিথ্যা ঘুমে চোখবন্ধ করলে গণ্ডচুম্বনে পুলকিত হচ্ছ। (শয্যামধ্যে) আমাকে স্থান দাও, আমি আর (ভবিষ্যতে) এমন বিলম্ব করব না।]

যমুনাকূলে কুঞ্জে বসে কৃষ্ণও ঠিক এরূপভাবেই রাধার উদ্দেশে বলছে—

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।

দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥—গীত ৩।৯

[ক্ষমা কর, এমন অপরাধ আমি আর কখনও করব না, সুন্দরি তোমার বিরহে কাতর হয়েছি। আমায় দেখা দাও।]

আমার হৃদয়ই তোমার বাসস্থান, আমার হৃদয়ে তুমি নিহিত—এরূপ কথা নায়িকা নায়কের উদ্দেশ্যে বলেছে, এমন কয়েকটি গাথা আছে।

'রাগভরিএবিহিঅএ সুহস ণিহিত্তো' (৭।৬৫), 'তুজ্ঝ বসই ত্তি হিঅঅ' (১।৪০) ইত্যাদি। কৃষ্ণও রাধাকে উদ্দেশ করে বলেছে 'তামহং হৃদি সঙ্গতাং নিশং' ইত্যাদি। রাধার ভ্রূপল্লব ধনু, অপাঙ্গবীক্ষণ (কটাক্ষ) তাঁর শর এবং শ্রবণপ্রান্ত সেই ধনুর গুণরূপ—

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি।
বাণা গুণঃ শ্রবণ পালিরিতি স্মরেণ ॥—গীত ৩।১৩

এর সঙ্গে সহজেই তুলনীয় এই গাথাটি—

মারেসি কং ণ মুদ্ধে ইমেণ রত্তন্ত তিক্‌খ বিসমেণ।
ভু-লআ-চাব বিণিগ্‌গঅ-তিক্‌খঅরদ্ধচ্ছিভল্লেণ ॥—৬।৪ (অজ্ঞাত)

[হে মুগ্ধে, তোমার পর্যন্তরক্ত, তীক্ষ্ণ ও বিষম ভ্রূলতাচাপ হতে বেরোনো এবং তীক্ষ্ণ আধবোজা এই চোখের বাণে কাকে না মারতে পার ?]

অবশ্য জয়দেব গাথাকারই দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন, এমন কথা এখানে জোরপূর্বক বলা চলে না। ভ্রূকে ধনু এবং নয়নকে বাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এমন সংস্কৃত কবিতা মিলবে। কালিদাসের নামে আরোপিত শৃঙ্গারতিলকে অনুরূপ ভাবের একটি শ্লোক পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই প্রকার—

ইয়ং ব্যাধায়তে বালা, ভ্রূরস্যাঃ কার্মুকায়তে।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে, মনো মে হরিণায়তে ॥—১৪শ শ্লোক

[এ বালিকা সাক্ষাৎ ব্যাধ। এর ভ্রূদ্বয় ধনু এবং কুটিল কটাক্ষ সুতীক্ষ্ণ বাণ। হায়, আমার মন এ ব্যাধের হাতে হরিণের মত হল।]

অবশ্য প্রাকৃত কবিতাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে করলে এই ভাবটি গাথা থেকেই সংস্কৃত কবিরা আহরণ করছেন স্বীকার করতে হয় এবং সে স্থলে জয়দেব পরোক্ষভাবে গাথাকার দ্বারা প্রভাবিত নির্দ্বিধায় বলা চলে। অনুরাগের প্রগাঢ়তায় নায়িকা প্রতি অঙ্গেই অনুভব করে নায়কের স্পর্শসুখ। দৈব যে হৃদয়স্থিত প্রিয়তমকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, তা সে ভালো জানে। তাই সে বলে—

রূঅং অচ্ছীসু ঠিঅং ফরিসো অঙ্গেসু জম্পিঅং কণ্ণে।
হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং বিওঅইং কিং খ দেব্বেণ ॥—২।৩২ (ব্রহ্মগতি)

[দৈব কি আমার চোখে লেগে থাকা (প্রিয়ের) রূপ, অঙ্গে জড়িত তার স্পর্শসুখ, কানে লেগে থাকা তার কথা এবং হৃদয়ে নিহিত তার হৃদয় বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হবে ?]

রাধার চিন্তামগ্ন কৃষ্ণও বলে—

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা
তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।

সা বিম্বাধর মাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধিহন্ত বিরহ ব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে ॥—গীত ৩।১৫

[তার চিন্তায় মন মগ্ন। সর্বাঙ্গে তার স্পর্শসুখ। চোখে সেই তরল স্নিগ্ধ দৃষ্টিবিভ্রম, নাসিকায় সুখপদ্মের সৌরভ আঘ্রাণ, কানে সেই সুধাক্ষরা বাণীশ্রবণ আর জিহ্বাতে বিম্বাধরের মাধুরী অনুভব করছি। তবুও বিরহব্যাধি বাড়ছে। হুবহু গাথারই ভাব আশ্রয়ে লেখা বললে কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। দয়িতকে ভোলা অসম্ভব, তার অনুভূতিতে সর্বেন্দ্রিয় বিভোর; এই কথাটিই গাথাটিতে গূঢ়। কৃষ্ণ রাধাকে সর্বেন্দ্রিয়ে অনুভব করছে, তাকে কিছুতে ভুলতে পারছে না এই অর্থ গীতগোবিন্দেও নিহিত। ভাব একই বলা যায়— তবে জয়দেবের কবিপ্রতিভা ভিন্নতর বাক্যবিন্যাসে নতুন রূপ দিয়েছে মাত্র। বিরহে নায়িকার আত্মপরভেদলুপ্ত। ধ্যানে দয়িতকে আলিঙ্গন করছে ভেবে সে নিজেকেই আলিঙ্গন করে।

সঅণে চিন্তামইঅং কাউণ পিঅং নিমীলিঅচ্ছীএ।
অপ্পাণো উপউঢ়ো পসিঢিল-বলআহিঁ বাহাহিং ॥—২।৩৩ (অজ্ঞাত)

[চোখ বুঁজে শয্যার উপর (সে কামিনী) নিজ প্রিয়কে চিন্তাস্থিত করে (বিরহে) প্রশিথিল বলয়যুক্ত বাহু দিয়ে নিজেকেই আলিঙ্গন করছে।]

কৃষ্ণবিরহাকুলা রাধাও এভাবেই কৃষ্ণকে ধ্যানে কল্পনা করে আলিঙ্গন করছে—

'ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীপদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥—গীত ৪।৮

[অতি দুর্লভ তোমার মূর্তি ধ্যান কল্পনা করে বিলাপ করছে, হাসছে, বিষন্ন হচ্ছে, কাঁদছে এবং কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দূর করছে।]

('ত্বৎপ্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি, পুনরন্তর্ধ্যানে বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনঃস্ফুরন্তং অনুধাবতি, পুনঃ প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি'—বালবোধিনী টীকা।)

জয়দেব এ ভাবটুকু গাথাকার থেকে নিয়েছিলেন, নিশ্চয় করে বলা যায় না, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ ভাবযুক্ত শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়—

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসম্প্লুতা ॥—১০।৩২।৮

[কোন গোপী নেত্ররন্ধ্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন, পরে আলিঙ্গনপূর্বক যোগীর ন্যায় চোখ বুঁজে পুলকিত দেহে আনন্দমগ্ন হয়ে রইল।]

জহ্লণের সূক্তিমুক্তাবলীতেও অনুরূপ ভাবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে—

ত্বাং চিন্তাপরিকল্পিতং সুভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিতা
শূন্যালিঙ্গনসঞ্চলদ্ভুজযুগেনাত্মানমালিঙ্গতি। ইত্যাদি—৪৪।২৩

[হে সুভগ, চিন্তাপরিকল্পিত তোমাকে (উপস্থিত) মনে করে সেই রোমাঞ্চিতা (বালা) শূন্যালিঙ্গনে প্রসারিত হাত দিয়ে নিজেকে আলিঙ্গন করে।]

এই শ্লোকটি যে উপরোক্ত গাথার ভাব অনুসরণে লেখা তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং।
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥—গীত ৪।২২

[রসালের শাখা তার অগ্রে পুষ্প দেখি।
কেমনে জীবন রহে তুমি তার সাক্ষী ॥
—রসময় দাসকৃত অনুবাদ]

ঠিক যেন নিম্নোক্ত গাথাটিরই ভাবেরই অনুরণন—

খেমং কত্তো খেমং জো সো খুজ্জম্বও ঘরদ্দারে।
তস্স কিল মত্থআও কো বি অণত্থো সমুপ্পন্নো ॥—৫।৯৯ (অজ্ঞাত)

[(আমার) কুশল কেমনে সম্ভব? গৃহদ্বারে যে ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষটি বর্তমান আছে, সেইটিই আমার ক্ষেম সূচনা করছে। (দেখ) এর মাথা থেকে কি একটা অনর্থভূত (অর্থাৎ) মুকুল বেরিয়েছে।]

একটি গাথাতে আছে—

অচ্ছেরং বণিহিং বিঅ সগ্গে রজ্জং ব অমঅ-পাণং ব।
আসি মৃহ তং মহুত্তং বিণিঅংসন-দংসনং তীএ ॥—২।২৫ (রাম)

[বিবস্ত্রাবস্থায় তার (সে রমণীর) দর্শন আমার নিকট সেই মুহূর্তে অদ্ভুতরূপ, নিধিপ্রাপ্তিরূপ, স্বর্গে রাজ্যলাভরূপ, এমন কি অমৃতপানরূপ প্রতীয়মান হয়েছিল।]

নগ্ননারীদেহের সৌন্দর্যদর্শনে যে নিধিপ্রাপ্তির আনন্দলাভ ঘটে, জয়দেবও সে কথা বলেছেন—

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥—গীত ৫।১৩

[হে কমললোচনে, কিশলয়সয্যাস্থিত তোমার মেখলাযুক্ত বস্ত্রহীন (অনাবৃত) জঘনদেশ দর্শনে কৃষ্ণ নিধিদর্শনের তুল্য আনন্দিত হবেন।]

হুবহু গাথার ভাবের অনুসরণে লেখা। এমন কি ভাষাও গাথা থেকে আহৃত। 'বিগলিত বসনং' এবং 'নিধিমিব' একরকম 'বিনিঅংসণ' ও 'নিহিংবিঅ'-রই সংস্কৃত পাঠ।

নায়ক আসছে ভেবে কুঞ্জে অপেক্ষমানা নায়িকার কান পেতে জীর্ণপত্রের মর্মর শব্দ শোনার একটি মনোরম চিত্র নিম্নের গাথাটিতে পাওয়া যায়—

আঅন্নেই অডঅণা কুডঙ্গ হেট্‌ঠম্মি দিন্ন-সংকেআ।
অগ্গ-পঅ-পেল্লিআণং মম্মরঅং জুন্ন-পত্তাণং ॥—৪।৬৫ (মধ্য)

[নিকুঞ্জতলে দত্তসংকেতা অসতী (তোমার) পাদাগ্রদ্বারা প্রহৃত জীর্ণপত্রগুলির মর্মর শব্দ শুনছে।]

ঠিক এই গাথার সঙ্গে একটা যেন ক্ষীণগত সাদৃশ্য নীচের বর্ণনাগুলিতে মিলে—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।—গীত ৫।১০

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি—গীত ৬।১১

প্রথমটিতে কৃষ্ণ পত্র শব্দে চমকিত রাধা আসছে ভেবে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে রাধা পত্রসঞ্চালনে চমকিত কৃষ্ণ আসবে ভেবে। জয়দেব কি গাথাকার থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন ?

প্রণয়কুপিতা কান্তাকে প্রসন্ন করার জন্য নায়ক বলছে—

দে সুঅণু পসিঅ এণহিং পুনো বি সুলহাইঁ রূসিঅব্বাইং।

এসা মঅচ্ছি মঅ লাঞ্ছণুজ্জলা গলই ছণ-রাঈ ॥—৫।৬৬ (অজ্ঞাত)

[হে সুতনু এখন প্রসন্ন হও, রোষভাব অন্য সময়ে সুলভ হবে। হে মৃগাক্ষি, চন্দ্রোজ্জ্বলা উৎসব রজনী শেষ হয়ে যাচ্ছে।]

ঠিক অনুরূপ ভাষাতেই দূতী রাধাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে—

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।

কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥—গীত ৫।১৪

[হরি তোমাতে অনুরাগী, রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমার কথা রাখ, সত্বর বেশবাস করে মধুরিপুর কামনা পূর্ণ কর।]

'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে'—বিরহবেদনায় রাধা যেদিকেই তাকায়, সেইদিকেই কৃষ্ণকে দেখতে পায়—এমন কথা দূতী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছে—

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।

তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥—গীত ৬।২

[নির্জনে তার অধরপানকুশল তোমাকেই দিকে দিকে দেখছে।]

এ তো নিম্ন গাথাটিরই ভাবের প্রতিলিপি বলা যায়—

জং জং পুলএমি দিসং পুরং লিহিও ব্ব দীসসে তত্তো

তুহ পডিমা—পডিবাডিং বহই ব সঅলং দিসা অক্কং ॥—৬।৩০ (অজ্ঞাত)

[যে যে দিকে তাকাই, সে সে দিকেই তোমাকে দেখতে পাই। সকল দিকচক্রই যেন তোমার ছবি সাজিয়ে রেখেছে।]

দূতী রাধার বিরহখিন্ন অবস্থার কথা কৃষ্ণকে জানাচ্ছে—

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।

পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥—গীত ৬।৩

[তোমার উদ্দেশে এগিয়ে কয়েক পা গিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।]

একটি গাথাকেও বিরহখিন্না নায়িকার অনেকটা এই পরিচয়ই মিলে—

তুহ দংসণে সঅণ্হা সদ্দং সোউণ নি গ্গআ জাইং।

তই বোলীণে তাইং পআইঁ বোঢ়ব্বিআ জাআ ॥—৬।৫ (অজ্ঞাত)

[তোমাকে দেখবে বলে কণ্ঠস্বর শুনে যে কয়েক পা এগিয়েছিল—তুমি চলে গেলে পর সেই কয়েক পা তাকে বয়ে আনতে হয়েছিল।]

নায়িকার গমনে অশক্তি ও ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়াই সূচিত হয়েছে এখানে।

পথিক প্রিয়াবিরহে প্রিয়াসদৃশ বস্তুকে কখনো আলিঙ্গন, কখনো চুম্বন, কখনো বা বুকে স্থাপন করছে—

অগ্‌ঘাই ছিবই চুম্বই ঠৈবই হিঅঅম্মি জণিঅ-রোমঞ্চো।
জাআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছং পহিও মহুঅ-উপ্‌ফং ॥—৭।৩৯ (অজ্ঞাত)

[দেখ পথিক জায়ার কপোলসদৃশ মধুকপুষ্পটিকে পেয়ে (কখনো এর) আঘ্রাণ নিচ্ছে, (কখনো একে) স্পর্শ করছে, (কখনো) বা চুম্বন করছে, কখনও রোমাঞ্চিত শরীরে বুকে রাখছে।]

রাধাও অনুরূপভাবে কৃষ্ণসদৃশ জলদবর্ণ অন্ধকারকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করছে—

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥—গীত ৬।৭

[হরি এসেছে এই ভেবে জলদসদৃশ গাঢ় অন্ধকারকেই আলিঙ্গন এবং চুম্বন করছে।]

রাধার এই বিরহউন্মত্ত ছবিটি অঙ্কনে জয়দেব পূর্বোক্ত গাথাটির দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দৃঢ়বিশ্বাস। লৌকিক নরনারীর প্রণয়রাগকে কেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ছাঁচে ঢেলে ফেলা হয়েছে, এগুলি থেকে তার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাবে।

কৃষ্ণের সঙ্গে রমণকারী কোনও নারীর সৌভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে রাধা বলছে—

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥—গীত ৭।১৩

[প্রিয়সখি কৃষ্ণ অবশ্যই কোন রমণীর সঙ্গে রমণ করছে। সে নারী আমাপেক্ষা গুণবতী সন্দেহ নেই। সে অবশ্যই কামযুদ্ধের উপযুক্ত বেশভূষায় সুসজ্জিত। তার কেশপাশ শিথিল হয়েছে এবং এর ফলে ফুল খসে পড়ছে।

একটি গাথাতেও রমণকারী নারীর অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়—

খিন্নস্স উরে পইণো ঠবেই গিম্হাবরণ্‌হ-রমিঅস্স।
ওল্লং গলন্তকুসুমং ণ্‌হাণ সুঅন্ধং চিউর-ভারং ॥—৩।৯৯ (অবন্তিবর্মা)

[গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণে রমণকারী খিন্ন পতির বুকের উপরে (প্রিয়তমা) তার ভেজা, গলিতপুষ্প ও স্নানসুগন্ধি চুলগুলি রাখছে।]

খণ্ডিতা রাধা প্রণিপাত সহকারে অনুনয়বিনয়কারী কৃষ্ণকে তিরস্কার করছে—

রজনিজনিত গুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষং
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্।

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং
তামনুসর সরসীরুহলোচন যাত্বহরতি বিষাদম্ ॥ – গীত ৮।২

[গত রাত্রির গুরুজাগরণজনিত আলস্যে তোমার রক্তবর্ণ চোখ বুঁজে আসছে। মনে হচ্ছে যেন, প্রণয়িনীর প্রেমরসাবেশের পরিস্ফুটিত অনুরাগ ধারণ করছে। হরি হরি, মাধব তুমি যাও। কেশব, তুমি যাও। আর কপট বাক্য বল না। হে কমললোচন, যে তোমার বিষাদ দূর করবে, তার কাছেই যাও।]

ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন না করলেও প্রথম চরণটির ভাষা একটি গাথার প্রথম চরণের ভাষার সদৃশ—

'উজ্জাগরঅ-কসাইঅ-গুরুঅচ্ছী'—৫।৮২ (অজ্ঞাত)

[নয়নদ্বয় অতি জাগরণে আরক্ত ও ভারাক্রান্ত।]

আর শেষের দুটি চরণের ভাব একটি গাথার ভাবের সঙ্গে মিলে। গাথাটিতে অন্যাসক্ত অথচ প্রিয়বাদী নায়ককে নায়িকা সরোষে বলছে—

হিঅআহিন্তো পসরন্তি জাইঁ অন্নাইঁ তাইঁ বঅণাইং।
ওসরসু কিং ইমেহিং অহরুত্তর-মেও-ভণিএহিং—৭।৫১ (অজ্ঞাত)

[হৃদয় হতে যে সকল বাক্য বল তা অন্যপ্রকারের। (কাছ থেকে) সরে যাও। এসব অধরোত্তর (অর্থাৎ কপট) বচনের কি প্রয়োজন আছে ?]

পাদপতিত নায়ককে ফিরিয়ে দেবার জন্য সখী নায়িকাকে অনুযোগ করছে—

পাঅ-পডিও ণ গণিও পিঅং ভণন্তো বি পি অপ্পিঅং ভণিও।
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্স কএ কও মাণো ॥ ৫।২২ (অজ্ঞাত)

[পায়ে পড়লেও গণ্য করনি। প্রিয় কথা বললেও অপ্রিয় শুনিয়েছ। চলে গেলেও তাকে রোধ করনি, বলত, কার জন্য এত মান ?]

রাধাকেও সখীরা অনুযোগ করছে এভাবেই—

স্নিগ্ধে যৎ পুরুষাসি যৎ প্রণমসি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি।
দ্বেষং যাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে ॥—গীত ৯।১০

[হে মানিনি ! তুমি যখন স্নেহবানের প্রতি নিষ্ঠুরতা, বিনম্রের প্রতি ঔদাসীন্য, অনুরাগীর প্রতি দ্বেষ ও প্রণয়িনীর প্রতি বিমুখতা দেখিয়েছ।]

অবশ্য এই জাতীয় কবিতা জয়দেবের পূর্বে সংস্কৃতে অনেক লিখিত হয়েছে। অমরুশতকে এ ভাবের কবিতার দৃষ্টান্ত মিলবে।

কৃষ্ণের বক্ষলম্বিত হারের বর্ণনা করিতে গিয়ে জয়দেব বলছেন—

হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্যবিদূরম্।
স্ফুটতরফেণকদম্বকরম্বিতমিত যমুনাজলপূরম্ ॥—গীত ১১।২৫

[কালিন্দী সলিলে ফেনপুঞ্জবৎ তদীয় বক্ষে লম্বিত মুক্তাহার শোভা পেতে লাগিল।]

এই বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে গাথারই অনুসরণে দেওয়া মনে করি। গাথাকারও নায়িকার বক্ষঃস্থিত হারের কথা বলতে গিয়ে যমুনার ফেনপুঞ্জের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

মগ্‌গংচিঅ অলহন্তো হারো পীণুন্নআণ অণআণং।

উব্বিগ্‌গো ভমই উরে জমুণা-ণই ফেণপুঞ্জো ব্ব ॥—৭।৬৯ (অজ্ঞাত)

[পীন ও উন্নত স্তনের মধ্যে পথ না পেয়ে হারটি যেন যমুনা নদীর ফেনপুঞ্জের ন্যায় উদ্বেগযুক্ত হয়ে (ইতস্ততঃ) ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

কান্তকে নিন্দা করে স্বয়ং পুরুষায়িত কার্যে ব্যাপৃতা কান্তাকে শ্রমক্লান্ত দেখে কান্ত পরিহাস করে বলছে—

সিহিপিচ্ছলুলিঅকেসে বেবন্তোরু বিণিমীলিঅচ্ছি।

দরপুরিসাইরি বিসুমরি জাণসু পরিসাণ জং দুক্‌খং ॥—১।৫২ (বেসর)

[হে ঈষৎ পুরুষায়িত কার্যে বিশ্রামশীলে! তোমার কেশ ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিস্রস্ত, তোমার উরু দুটি কাঁপছে, তোমার চোখ বুঁজে আসছে, এখন বোঝ পুরুষদের কতখানি দুঃখ।]

ঠিক এই ভাবই ধ্বনিত হয়েছে রাধা ও কৃষ্ণের বিপরীত রতিবিহারের বর্ণনায়—

মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস

প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।

নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোর্বল্লিরুৎকম্পিতং

বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥—গীত ১২।১২

[রতিকেলিরূপসংকুল যুদ্ধে কান্তকে জয় করার জন্য বুকে আরোহণ করে সাহসভরে রাধা যে কাজ আরম্ভ করেছিল, তাতে তার জঘনস্থলী নিষ্পন্দ, বাহুলতা শিথিল, বুক কম্পিত ও চোখ নিমীলিত হয়েছিল। স্ত্রীলোকে কি কখন পুরুষোচিত কার্য করতে পারে।]

জয়দেব যে 'গাহাসত্তসঈ'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। এ পর্যন্ত গাথাগুলির সঙ্গে জয়দেবের যে ভাবসাদৃশ্য দেখিয়েছি তাতে জয়দেবের অসাধারণ কবিত্বশক্তি গাথাগুলিকে নবতর মাধুর্যে সিঞ্চিত করে রসের নির্ঝর করে তুলেছে, দেখা যাবে। জয়দেব গাথাকারদের তুলনায় রমণীয় লালিত্য ও রসসৌন্দর্যের পরিচয় দিলেও নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মনে হয়, জয়দেবের কবিপ্রতিভা অত্যন্ত ম্লানচিত্র এঁকেছে। সুরতাবসানে, মন্মথের উদ্দাম ক্রীড়ার সমাপ্তিতে রাধার সচেতন দৃষ্টি আবিষ্কার করেছে নিজের নগ্নতা। লজ্জাবিষ্টা রাধা কৃষ্ণের লুব্ধদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্তন ও জঘনদেশকে হাতের দ্বারা আবৃত করেছে।

কাঞ্চী কাঞ্চিদ্‌গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ।

পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিপ্লুলিত স্রগ্ধরেয়ং বিনোতি ॥—গীত ১২।১৮

[স্খলিতকাঞ্চী, বিবসনাহেতু স্তন ও জঘনদেশ হাত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক লজ্জিত দৃষ্টিপাতে আমায় আনন্দিত করছে।]

কৃষ্ণের ক্ষুধিত দৃষ্টি থেকে রাধার এ ভাবে আত্মরক্ষার প্রয়াস এবং কৃষ্ণের তাই দেখে আনন্দলাভ এতে কাব্যসৌন্দর্য বেড়েছে বলে মনে হয় না। বরং দৃষ্টিপীড়নকারী এক চিত্রের সম্মুখীন হতে হয়ে আমাদের সৌন্দর্যবোধ পীড়িত হয়। অথচ একটি গাথাতেও সুরতাবসানে নগ্ন নারীর লজ্জাবিধুরতা দেখানো হয়েছে এবং এমন শোভন সুন্দর করে দেখানো হয়েছে যে গাথাকারের কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে থাকা যায় না। গাথাটি এই—

রইবিরমলজ্জিআও অপ্পত্ত-ণিঅংসণাওঁ সহস ব্ব।
ঢক্কস্তি পিঅমালিঙ্গণেণ জহণং কুলবহূও ॥—৫।৫৯ (অজ্ঞাত)

[রমণের বিরাম সময়ে লজ্জিতা কুলবধূরা সহসা বস্ত্র না পেয়ে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করে জঘনদেশ আচ্ছাদন করে থাকে।]

প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করে নগ্নতা ঢাকবার প্রয়াসটি কবিত্বের দিক থেকে যে খুবই উচ্চাঙ্গের এ বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হবেন।

গাথাগুলির শৃঙ্গাররসযুক্ত ভাবরাজি জয়দেবের গীতগোবিন্দে সঞ্চারিত হয়েছে এতাবৎ আলোচনা থেকে তা পাওয়া গেল। শৃঙ্গাররসপ্রধান এই গাথাগুলির পশ্চাতে কোন কোন সমালোচক উৎকট আদিরসের বাহুল্য লক্ষ্য করেছেন।[২৩] তা খুবই সত্য সন্দেহ নেই, তবুও এই গাথাগুলির কাব্যরস আস্বাদনে এমনই আনন্দ পাওয়া যায় যে, তীব্র আদিরসের ঝাঁঝকে তা মুহূর্তেই ভুলিয়ে দেয়। আর গাথাগুলির সর্বত্রই যে শৃঙ্গাররস ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল তা মনে হয় না। এ বিষয়ে অধ্যাপক অজিত দত্ত যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "গাথাসপ্তশতীর সমস্ত কবিতাই অতিমাত্রায় প্রেমপ্রগল্‌ভ নয়। তবে টীকাকারগণ সম্ভবতঃ তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রায় প্রত্যেকটি গাথার মধ্যেই প্রেমব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করায় এবং দেহজ প্রেম-সম্ভোগের কথাই বেশি করে পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতাগুলি অতিমাত্রায় erotic বলে ধারণা জন্মাতে পারে"[২৪] আদিরসের হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য যে উচ্চকোটির রসজ্ঞ সমালোচকের এই অভিমত নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য।[২৫]

কেবল গোবর্ধনাচার্য ও জয়দেব নন, সেনকুলতিলক লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের

২৩। "'গাথাসপ্তশতী'র কবিতাগুলি সবই পণ্ডিত কবির রচনা নয়। এবং অধিকাংশ কবিতার ভাবও উচ্চনীতিগর্ভ নয়, বরং বিপরীত। অধিকাংশই আদিরসের এমন কি স্থূল আদিরসের, মেয়েলি আদিরসের কবিতা" ডঃ সুকুমার সেন : ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সং, পৃঃ ৪০৯।

২৪। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩, পৃঃ ২৭১।

২৫। "মুখ্যত আদিরসের রচনা হলেও……হালের সংগৃহীত প্রাকৃত গাথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য খুব উচ্চকোটির।"—মনোমোহন ঘোষ : প্রাকৃত সাহিত্য, পৃঃ ৩৫।

অন্যতম ধোয়ী, শরণ এবং উমাপতিধরও যে 'গাহাসত্তসঈ'র ভাবপ্রেরণায় শ্লোক লিখেছিলেন, তা নিম্ন আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে।

ধোয়ীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'পবনদূত', মেঘদূতের আদর্শে মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা। রাজা লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দেশে গেলে কুবলয়বতী নামে এক গন্ধর্বকন্যা তাঁর প্রেমমুগ্ধা হয়। বসন্তকালে বিরহবিধুরা কুবলয়বতী পবনকে লক্ষ্মণসেনের নিকট গৌড়ে দূত হিসাবে পাঠানোর প্রস্তাব করছে, এই হল কাব্যের উপজীব্য। এতে 'গাহাসত্তসঈ'র গাথার ভাবাদর্শে রচিত দু একটি শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হল—

রাজন্নুর্বীবলয়বনিতাকামুক ত্বৎসকাশা—
দাশাতন্তুর্ভবতু সুদৃশো দুর্লভঃ প্রেমতন্তুঃ।
কষ্টাৎ কষ্টং পুনরিদমহোস্বপ্নসঙ্কেতদূতী
নিদ্রাপ্যস্যাঃ ক্ষণমপি ন যন্নেত্রসীমামুমেতি ॥—৮৪

[হে রাজন্, আপনি উর্বীবলয়বনিতাকামুক। আপনার সমীপে আশাতন্তু সুখদর্শন-যোগ্য কিন্তু প্রেমতন্তু দুর্লভ। ইহা কষ্ট অপেক্ষাও কষ্টতর। অহো স্বপ্নসঙ্কেতদূতী নিদ্রা ক্ষণতরেও নেত্রসীমার গোচরীভূত হইতেছে না।]

এর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে 'গাহাসত্তসঈ'র নিম্নোক্ত গাথাটি—

ধণ্ণা তা মহিলাও জা দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছন্তি।
ণিদ্দ চ্চিঅ তেণ বিণা ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং ॥—৪।৯৭ (মলয়শেখর)

[যারা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দেখে সেই মহিলারা ধন্য। তার বিরহে (আমার) ঘুমই আসে না, কে স্বপ্ন দেখবে ?]

'পবনদূত' ছাড়াও ধোয়ীর নামাঙ্কিত কিছু শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতমুক্তাবলী ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি কোশকাব্যে ধৃত হয়েছে। এই শ্লোকগুলির কোন কোনটিতে গাথা-গুলির ভাবছায়া দৃষ্ট হবে। সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত ধোয়ীর এই শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপ—

সংরুদ্ধাঃ কথমপ্যমঙ্গলভয়াৎ পক্ষ্মান্তরব্যাপিনো
হপ্যুত্তানীকৃতলোচনং নিপুণয়া বাষ্পাম্ভসাং বিন্দবঃ।
ন্যস্যন্ত্যাঃ সহকারপল্লবমথ ব্যানম্য পত্যুঃ পুরো
ধারাহবাহিভিরেব লোচনজলৈর্ধারাঘটঃ পূরিতঃ ॥—২।৫১।২

[চতুর রমণী পক্ষ্মব্যাপী অশ্রুবিন্দুগুলি অমঙ্গলভয়ে চোখ তুলে অতি কষ্টে নিবারণ করছে। (কিন্তু) পতির সামনে নত হয়ে আম্রশাখা রাখার কালে তার অশ্রুধারায় জলঘট ভরে গেছে।]

এর সঙ্গে তুলনীয় এই গাথাটি—

পিঅ-সংভরণ-পলোট্টন্ত-বাহধারা-ণিবাঅ-ভীআএ।
দিজ্জই বঙ্ক-গ্গীবাএ দীবও পহিঅ-জাআএ ॥—৩।২২ (ব্রহ্মচারী)

[প্রিয়জনের স্মরণে, চোখে আগত অশ্রুর (দীপের উপর) পতনরূপ (অমঙ্গলের) ভয়ে ভীত হয়ে, পথিকজায়া গ্রীবা বাঁকিয়ে (সন্ধ্যা) দীপ দিচ্ছে।]

নখক্ষতযুক্ত জঘনে মেখলাস্পর্শের ফলে রমণীর মুখবিকারের কথা একটি গাথাতে পাওয়া যাচ্ছে—

মসিণং চঙ্‌কম্মন্তী পএ পএ কুণই কীস মুহভঙ্গং।
ণূণং সে মেহলিআ জহণ-গঅং ছিবই ণহ-বন্তিং ॥—৫।৬৩ (অজ্ঞাত)

[কেন মসৃণ পথে যেতে যেতে প্রতিপদে মুখবিকার করছে? নিশ্চয়ই তার মেখলা জঘনগত নখ (ক্ষত) পংক্তি স্পর্শ করছে।]

ধোয়ীর নিম্নোক্ত শ্লোকটিতেও এ ধরণের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এটি রচনাকালে উপরোক্ত গাথাটির স্মৃতি কবির মনে জাগরূক ছিল, এরূপ অনুমান মনে করি অসংগত নয়। শ্লোকটি এই—

নিদ্রাজিহ্মসদৃশঃ সখীষ্বপি সবৈলক্ষ্য নখাঙ্কব্রণ-
ব্যাদষ্টাংশুকলেখয়া প্রতিপদং সীৎকারিবক্তেন্দ্রবাঃ।
ত্বৎসেবাসমুপাগতক্ষিতিভুজাং নির্যান্তি লীলাগৃহা-
দেতাঃ প্রৌঢ়রতিশ্রমপ্রশিথিলৈরঙ্গৈঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥—স. ক. ৩।৩৩।৩

[আপনার সেবার্থ উপস্থিত রাজগণের প্রমোদগৃহ থেকে মৃগনয়না রমণীরা ঘুমজড়ানো চোখে, সখীদের প্রতি উদাসীন হয়ে, নখক্ষতে বস্ত্রলগ্ন হয়ে, পদে পদে মুখের ব্যথাব্যঞ্জক সীৎ সীৎ শব্দ করতে করতে অতিরিক্ত রতিশ্রমে শ্রান্তশরীরে বের হচ্ছে।]

শরণের কোন কাব্যগ্রন্থ নেই। তবে তিনি সুকবি ছিলেন, তার প্রমাণ সদুক্তিকর্ণামৃত ও পদ্যাবলীতে তদ্‌রচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি। সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত শরণের একটি শ্লোক নিম্নলিখিতরূপ—

বাষ্পৈর্নিষ্পতয়ান্বুভিঃ কলুষিতা গণ্ডস্থলী চিন্তয়া
চেতঃ কাতরিতং তরঙ্গিতমুরঃ শ্বাসোর্মিভিঃ পীবরৈঃ।
ইত্থং তদ্বিরহে তদীয় বিপদং দেবী প্রিয়ামৈব বা
তল্পং বা পরিতাপখিন্নমথবা জানাতি পুষ্পায়ুধঃ ॥—২।৩৬।৪

[প্রবাহিত বাষ্পধারায় তার কপোল মলিন এবং দীর্ঘশ্বাসে বক্ষস্থল কম্পিত হয়েছে, এইরূপ তোমার বিরহে তার বিপত্তি রজনী দেবী, পরিতাপখিন্ন শয্যা অথবা কুসুমধনু জানে।]

একটি গাথাতেও এরূপ শুষ্কমলিনদীর্ঘশ্বাসখিন্ন বিরহিণীর পরিচয় পাওয়া যায়—

দীহুণহ-পউর-ণীসাস-পআবিত্ত বাহ-সলিল-পরিসিত্তো।
সাহেই-সাম-সবলং বতীঅ অহরো তুহ বিওএ ॥—২।৮৫ (অজ্ঞাত)

[তোমার বিরহে তার অধর দীর্ঘ, উষ্ণ ও প্রচুর নিঃশ্বাসে তপ্ত ও বাষ্পজালে আর্দ্র হয়ে যেন শ্যামশবল নামক ব্রতবিশেষ (এই ব্রতে নিয়মকারীর প্রথমতঃ আগুনে এবং পরে জলে প্রবেশের বিধি আছে) পালন করছে।]

শ্লোকটির গাথার ভাববস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। যেখানে 'গাহাসত্তসঈ' গোবর্ধনাচার্য, জয়দেব প্রভৃতির পরিচিত ছিল, সেখানে শরণেরও নিশ্চয়ই পরিচিত ছিল এমন অনুমানে বাধা নেই। তাই যদি হয়, 'গাহাসত্তসঈ'র গাথার ভাব অনুসরণে এই শ্লোকটি রচনা অপ্রত্যাশিত নয়।

পঞ্চরত্নের অন্যতম কবি উমাপতিধর যে 'গাহাসত্তসঈ'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা দৃঢ়মত পোষণ করি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্পষ্টভাবেই 'গাহাসত্তসঈ'র একটি গাথার ভাব অবলম্বনে রচিত, আমাদের বিশ্বাস। শ্লোকটি এই—

নামীভিঃ প্রসবৈঃ স্বয়ং নিপতিতৈর্ভূমী বিধত্তে ধৃতিং
নারোঢ়ুং পরিপাকমেদুরফলাঃ শক্নোতি শাখাশিখাঃ।
অপ্রজ্ঞাতনিজপ্রভাবকুপিতঃ কোকূয়মানো রুষা-
কূর্দন্ বানরসূনুরেষ লবলীক্ষোণীরুহং কর্ষতি ॥—৪।৪৮।২

[এই ক্ষুদ্র বানরটি মাটিতে পড়ে থাকা ফলগুলি দেখে ধৈর্য ধরতে পারছে না, পক্কতাহেতু কোমল ফলযুক্ত শাখাগ্রেও উঠতে পারছে না। নিজের ক্ষমতাটুকু জেনে রেগে কো কো শব্দ করছে এবং লাফাতে লাফাতে লবলীগাছ ধরে টানছে।]

এর সাথে তুলনা করুন—

ওসরই ধুণই সাহং খোক্‌খা মুহলো পুণো সমুল্লিহই।
জম্বু-ফলং ণ গেণ্হই ভমরো ত্তি কঈ পঢম-ডক্কো ॥—৬।৩১ (অজ্ঞাত)

[ভ্রমরকর্তৃক প্রথমতঃ দষ্ট হয়ে (তন্তয়ে) বানর উচ্চস্বরে খোক্‌খা শব্দ করে (জম্বু গাছ থেকে) সরে পড়ছে, (এর) ডাল কাঁপাচ্ছে এবং পুনর্বার (নখ দ্বারা) দাগ কাটছে, কিন্তু ভ্রমর আছে মনে করে জম্বুফল (খাবার জন্য) নিচ্ছে না।]

কবি উমাপতিধর একটি শ্লোকে কৃষ্ণ দ্বারকাতে রুক্মিণীকে বুকে ধারণ করেও যমুনা-তীরস্থ বেতসকুঞ্জে আভীর রমণীদের স্মরণ করছে, এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াং
রুক্মিণ্যাপি প্রততপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীরবাণীরকুঞ্জে-
ষ্বাভীরস্ত্রীনিভৃত চরিতধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ॥[২৬]—স. ক. ১।৬১।১, পদ্যাবলী ৩৭১

[যে কৃষ্ণ দ্বারকার রত্নশোভামণ্ডিত সমুদ্রযুক্তমন্দিরে রুক্মিণী কর্তৃক প্রবল পুলকে আলিঙ্গিত হয়েছিলেন, সেই কৃষ্ণের যমুনাতীরস্থ স্নিগ্ধ বেতসকুঞ্জে আভীররমণীদের নিভৃত চরিত্র স্মরণজনিত ধ্যানমূর্ছা বিশ্ব পালন করুক।]

২৬। শ্রীরূপ গোস্বামী 'আভীরস্ত্রীনিভৃতচরিত'-এর পরিবর্তে 'রাধাকেলীপরিমলভরঃ' পাঠ বসিয়েছেন। দ্রষ্টব্য—The Padyavali of Rupa Gosvamin—Edited by S. K. De (The University of Dacca, 1934), pp. 199-200. পদ্যাবলীর শ্লোক সংখ্যা ডঃ দের সংস্করণ অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

এই শ্লোকের মর্মের সঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা দুটির মর্মের যেন এক দূরাগত সাদৃশ্য প্রতীত হয়। গাথা দুটি এই—

সচ্চং ভণামি মরণে ট্ঠিঅম্হি পুণ্ণে তডম্মি তাবীএ।
অজ্জ বি তত্থ কুড়ঙ্গে ণিবডই দিট্ঠী তহ চ্চেঅ ॥—৩।৩৯

[সত্যই বলছি, মরণপথে সন্নিহিত হয়েছি বটে, (কিন্তু) আজও তাপীনদীর পুণ্য-তটস্থিত সেই নিকুঞ্জেই আমার দৃষ্টি তেমনভাবেই পড়ছে।]

আম বহলা বণালী মুহলা জলরঙ্কুণো জলং সিসিরং।
অন্ন-ণঈণ বি রেবাই তহবি অন্নে গুণা কে বি ॥—৬।৭৮ (অজ্ঞাত)

[সত্যই বটে যে, অন্যান্য নদীরও (তট) বিস্তৃত বনরাজি, শব্দমুখর জলরঙ্কু পক্ষিগণ এবং সুশীতল জল বিদ্যমান আছে, তথাপি রেবানদীর আরও অন্য কোন অতিরিক্ত গুণ আছে।]

শ্লোকটি রচনাকালে উমাপতিধর গাথা দুটির ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ধারণা করতে ইচ্ছা হয়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করা গেল না। শীলাভট্টারিকার নামে প্রচলিত নিম্নোক্ত বিখ্যাত শ্লোকটি যেন অবিকল এই গাথা দুটিরই ভাবসূত্রে বিধৃত মনে হয়। শ্লোকটি বহু কোশগ্রন্থে, অলংকার শাস্ত্রে উদ্ধৃত হয়েছে।[২৭] শ্লোকটি এই—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

[যে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল, সেই আমার বর, সেই সকল চৈত্র মাসের রাত্রি, সেই সকল বিকশিত মালতীর গন্ধ, সেই সকল বর্ধিত কদম্ববনসম্বন্ধীয় বায়ু, আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটে বেতসীতরুতলে যে সুরতব্যাপার ঘটেছিল, তাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।]

২৭। সুভাষিতরত্নকোশ (কস্যচিৎ) ৮১৫, সদুক্তিকর্ণামৃত (কস্যচিৎ) ২।১।২৩, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি (শীলাভট্টারিকা) ৩৭৬৮, সূক্তিমুক্তাবলী (শীলাভট্টারিকা) ৮৭।৯, মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ (কস্যচিৎ), ১।১, গোবিন্দের কাব্যপ্রদীপ (কস্যচিৎ), সাহিত্য-দর্পণ (কস্যচিৎ) ১।২, কেশব মিশ্রের অলংকারশেখর (কস্যচিৎ), বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের অলংকারকৌস্তুভ (কস্যচিৎ), নরেন্দ্র প্রভাসূরির অলংকার মহোদধি (কস্যচিৎ), পদ্যাবলী (কস্যচিৎ) ৩৮২, গোপালচম্পূ (কস্যচিৎ) উত্তর ৩৬।১৬৬। সুভাষিতরত্নকোশে 'রেবারোধসি' স্থলে 'কিং মে রোধসি' পাঠ আছে। এ ছাড়াও আরও কিছু পাঠান্তর আছে। তন্মধ্যে 'কদম্বানিলাঃ' স্থলে 'বিন্ধ্যানিলাঃ' উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরূপ গোস্বামী এরই ভাব অনুসরণে তাঁর এই বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা করেছিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥—পদ্যাবলী ৩৮৩

[কুরুক্ষেত্রমিলিত এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, উভয়ের সেই সঙ্গমসুখ ; তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরযুক্ত যমুনাপুলিনস্থ বনের প্রতি আমার মন স্পৃহালু হচ্ছে।]

কেবল লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চ কবি নন, ঐ কালের কিংবা তৎপূর্বের বাংলাদেশের অন্যান্য কবিরাও 'গাহাসত্তসঈ'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এ অনুমানও করা যায়। সুভাষিত-রত্নকোশ ও সদুক্তিকর্ণামৃতে বেশ কিছু বাঙালী কবির রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। যাঁদের বাঙালীত্ব মোটামুটি পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত, তাঁদের মধ্যে গৌড় অভিনন্দ, লক্ষ্মীধর, চন্দ্রযোগী, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, গদাধর বৈদ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের দু একজনের শ্লোক উদ্ধৃত করে 'গাহাসত্তসঈ'র গাথার সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্য আলোচনা করা গেল। ভট্টশালীয় পীতাম্বরের মাত্র দুটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি নিম্নলিখিতরূপ—

একদ্বেষু রসালশাখিষু মনাগুন্মীলিতং কুড্‌মলৈঃ
কর্ণাকর্ণিকয়া মিথঃ কথমমী ঘূর্ণন্তি বিশ্লেষগাঃ।
দ্বিত্রৈঃ কাপি কিল শ্রুতাশ্রুতমপি স্পষ্টাস্পৃষ্টারুতং
বিষঙ্‌মূর্চ্ছতি দুঃসহো বিরহিণীগেহেষু হাহারবঃ ॥—২।১৫১।৪

[দু একটি আম গাছে মুকুল হয়েছে, ঐ সকল পথিক পরস্পর কানে কানে কি বলে কষ্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুই তিন ব্যক্তি কোকিলের ডাক স্পষ্ট শুনেছে বা শোনে নি, চারদিকে বিরহিণীগৃহে হাহাকার উঠছে।]

এর সঙ্গে তুলনা করুন—

রাঅ-বিরুদ্ধং ব কহং পহিও পহিঅস্‌স সাহই সসঙ্কং।
জত্তো অম্বাণ দলং তত্তো দর-ণিগঅং কিং পি ॥—৪।৯৬ (বহুল্ল)

[আম গাছের যেখান থেকে পাতার বা দলের উদ্গম হয়, সেই স্থান থেকে ঈষৎ নির্গত কি (অঙ্কুর) যেন দেখা যাচ্ছে,—রাজবিরুদ্ধ কথার ন্যায়, এই কথাই সশঙ্কভাবে এক পথিক অপর পথিকের নিকট বলছে।]

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত গদাধরবৈদ্যের একটি শ্লোক নিম্নলিখিতরূপ—

বারাং ধারণমধ্বনীনবিধুরচ্ছেদায় ভৃঙ্গস্রজাং
হর্ম্যায়াম্বুজসং চয়ঃসিতগুরুৎপ্রীত্যৈ মৃণালগ্রহঃ।
কা বা তস্য কথার্থিতস্য সরসো যত্তীরজন্মাপ্যসৌ
দূরাদেব দৃশোঃ শ্রমং হরতি নঃ স্নিগ্ধাবলোকস্তরুঃ ॥—৪।২১।৩

[পান্থজনের ক্লেশ দূরের জন্য জলধারণ, ভ্রমরের আনন্দের নিমিত্ত পদ্মসঞ্চয়, চাঁদের প্রীতির জন্য মৃণালধারণ, সেই মূল্যবান সরোবরের কথা (আর কি বলব)—যার তীরজাত স্নিগ্ধদর্শন গাছও দূর থেকে আমাদের চোখ জুড়োয়।]

এর সুরের সঙ্গে নিম্নোক্ত গাথার সুরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

অচ্ছউ দাব মণহরং দিআই মুহ-দংসণং অই-মহগ্ঘং।
তগ্গাম-ছেত্ত-সীমা বি ঝিত্তি দিট্ঠা সুহাবেই ॥—২।৬৮ (অজ্ঞাত)

[প্রেয়সীর অতিমহার্ঘ মনোহর মুখ দেখা দূরে থাক, তার গ্রামের ক্ষেত্রসীমা যদি চোখে পড়ে, তাও (মনে) সুখ দেয়।]

কুলবধূদের আচরণীয় সম্পর্কে সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত লক্ষ্মীধরের একটি শ্লোক নিম্নলিখিতরূপ—

শিরো যদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
গতং পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশৌ।
বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
নিজং তদীয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচৈঃ কুলম্ ॥—২।১১।৪

[যার মস্তক অবগুণ্ঠিত ও সহজাত লজ্জায় আনত, যার গতি মন্থর ও চরণকোটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ, যার বাক্য পরিমিত ও মন্দ মন্দ মধুর অক্ষর বিশিষ্ট, সেই অঙ্গনাই উচ্চকুলসম্ভূত বলা যায়।]

এর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে এই গাথাটি—

হসিঅং অদিট্ঠ-দন্তং ভমিঅমণিক্কন্ত-দেহলী-দেশং।
দিট্ঠমণুক্খিও-মুহং এসো মগ্গো কুল-বহূণং ॥—৬।২৫ (অজ্ঞাত)

[কুলবধূগণের এই রীতি—দাঁত না দেখিয়ে হাসতে হয়, দেহলীদেশ অতিক্রম না করে ভ্রমণ করতে হয় এবং মুখ না তুলে দেখতে হয়।]

সেনকুলতিলক লক্ষ্মণসেনেরও কয়েকটি শ্লোক রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত একটি শ্লোক নিম্নলিখিতরূপ—

সদা চাটূল্লাসততমুপহারার্পিতমনা
মুখং পশ্যন্নিত্যং সততমবিভিন্নাঞ্জলিপুটঃ।
অনিচ্ছন্নিচ্ছন্ বা ক্ষণমপি ন পার্শ্বং ত্যজতি যঃ
সঃ কিং কামী স্ত্রীণাময়মশরণো ভৃত্যপুরুষঃ ॥—২।৮০।১

নিয়ত চাটুবাক্যের বক্তা, সতত উপহারে আসক্ত চিত্ত, অবিরত মুখাবলোকনকারী, নিরন্তর করযোড়ে স্থিত এবং যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্ষণিকের জন্যও পার্শ্ব ত্যাগ করে না, এই সেই নারীর প্রতি কামপরায়ণ অথবা অসহায় ভৃত্য।]

এর সঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাটির ভাবের যেন একটা ক্ষীণগত সাদৃশ্য রয়েছে। লক্ষ্মণসেন এই

গাথাটি পড়ে শ্লোকটি লিখতে উৎসাহিত হয়ে থাকতে পারেন, এমন অনুমান করা যায়। গাথাটি এই—

ণ্‌মেন্তি জে পহুত্তং কুবিঅং দাসা ব্ব জে পসাঅন্তি।
তে ব্বিঅ মহিলাণ পিআ সেসা সামি ব্বিঅ বরাআ ॥—১।৯১

[যে পুরুষেরা (কান্তাবিষয়ে) নিজ প্রভুত্ব গোপন করে রাখে এবং যারা দাসের ন্যায় কুপিতা কান্তাকে (অনুনয় দ্বারা) প্রসন্ন রাখে, তারাই মহিলাদের প্রিয় হয়ে থাকে, আর তা ভিন্ন অন্য পুরুষেরা শোচ্য স্বামিশব্দে আখ্যাত হয় (অর্থাৎ প্রিয় হয় না)।]

সদুক্তিকর্ণামৃতে কবির নাম নেই, অথচ পদ্যাবলীতে 'গোবর্ধনাচার্য' নামাঙ্কিত একটি শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান যে, এই গোবর্ধন আচার্য 'আর্য্যাসপ্তশতী' রচয়িতা গোবর্ধনাচার্যই হবেন। আর্য্যাসপ্তশতীতে কিন্তু শ্লোকটি নেই। শ্লোকটি এইরূপ—

পান্থ দ্বারবতীং প্রয়াসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো
বক্তব্যঃ স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপ্যোঽপি নামোজ্ঝিতাঃ।
এতাঃ কেতকগর্ভধূলিপটলৈরালোক্য শূন্যা দিশঃ
কালিন্দীতটভূময়োঽপি ভবতো নায়ান্তি চিন্তাস্পদম্ ॥[২৮]—১।৬২।২ ;
পদ্যাবলী ৩৭৪

[হে পথিক, তুমি যদি দ্বারকায় যাও, তাহলে দেবকীনন্দনকে বলো, মদনের মোহমন্ত্রে বিকল গোপীগণকে তুমি ত পরিত্যাগ করেছ। (কিন্তু) কেতকের পরাগরাশিতে অন্ধকার-দিক ও যমুনাতীরের স্থানগুলি তোমার স্মরণ হয় না কি ?]

ঠিক অবিকল এই ভাবই ধ্বনিত হয়েছে এমন একটি গাথা মিলে। গাথাটি এই—

অকঅণ্ণুঅ ঘণ-বণ্ণং ঘণ-বণ্ণন্তরিঅ-তরণি-অর-ণিঅরং।
জই রে রে বাণীরং রেবা-ণীরং পি ণো ভরসি ॥—৬।৯৯ (অজ্ঞাত)

[রে রে অকৃতজ্ঞ, যে বেতসকুঞ্জ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং যেখানে সূর্যকিরণ ঘন পত্রে আচ্ছাদিত, সেই বেতসকুঞ্জ যদি মনে নাও করতে পার, তবে কি রেবা নদীর জলও স্মরণ করতে পার না ?]

গাথাটিরই ভাবসূত্র অবলম্বনে শ্লোকটি লিখিত, এমন অনুমান অসংগত মনে করি না। ষোড়শ শতাব্দীর কবি কর্ণপূর তাঁর 'অলংকারকৌস্তুভ' গ্রন্থে প্রাকৃতে কতকগুলি গাথা রচনা করেছেন।[২৯] আনন্দবর্ধন প্রভৃতি যেমন ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে 'গাহাসত্তসঈ'র

২৮। শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বের মতই এখানেও পাঠ পরিবর্তন করেছেন। 'কেতকগর্ভঃ' স্থলে 'কেলিকদম্বঃ' করেছেন।

২৯। মোট তেইশটি গাথা পাওয়া যাচ্ছে। ২য় কিরণ—৮, ৩য় কিরণ—১১, ৪র্থ কিরণ—১, ৫ম কিরণ—১, ৮ম কিরণ—২। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত এবং বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি থেকে ১৯২৬ খ্রীঃ প্রকাশিত অলংকারকৌস্তুভের অনুসরণে এই সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বহু গাথা উদ্ধার করেছেন, কবি কর্ণপূরও তেমনি ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে স্বরচিত গাথাগুলি প্রয়োগ করেছেন। এই গাথাগুলি রচনার ব্যাপারে হালকবির দ্বারা তিনি যে প্রাণিত হয়েছিলেন, এ অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। মনে হয়, রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাঢ্য শ্লোকসমূহের দ্বারা ব্যাখ্যাত অলংকারকৌস্তভে কবি কর্ণপূর স্বাভাবিকভাবেই লৌকিক মানবমানবীর প্রেমগাথাকে ধ্বনির উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করতে চান নি।[৩০] তাই হালকবির গাথার অনুকরণে নিজেই ব্যঞ্জনাঢ্য রাধাকৃষ্ণপ্রেমগাথা প্রাকৃতে রচনা করেছেন। নিম্নপ্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে এ ধারণা সমর্থিত হবে।

মানিনী রাধা নখ ছাড়া সকল অঙ্গ ঢেকে রেখেছে। কিন্তু নখে বিম্বিত হয়েছে কৃষ্ণতনু। চরণ-নখর কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছে, একথা সখীরা পরিহাসছলে জানাচ্ছে—

হিঅঅং চেবঅ অণচ্ছং মাণং সিণি ণ উণ দে অংগং।
আলিংগতি পআণং ণহরা পডিবিং বিঅং কণ্‌হ ॥—২য় কিরণ

[তোমার হৃদয়ই অনচ্ছ, কিন্তু অঙ্গ সেরূপ অনচ্ছ নহে। দেখ, তোমার চরণনখর প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছে।]

কবি কর্ণপূরের এই গাথাটি পড়লেই 'গাহাসত্তসঈ'তে কোনও গোপী কর্তৃক অন্য গোপীর গণ্ডস্থলে বিম্বিত কৃষ্ণমুখচুম্বনের গাথাটি মনে পড়ে—

ণচ্চণ-সলাহণ-ণিহেণ পাস-পরিসংঠিআ ণিউণ-গোবী।
সরিস-গোঁবিআণ চুম্বই কবোল-পডিমা গঅং কণ্‌হং ॥—২।১৪

স্থানটি নির্জন। অতএব কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গমের উপযুক্ত স্থান এই ভাবই নিম্ন গাথাটিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে—

৩০। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীজীব তাঁর 'ভক্তিরসামৃতশেষ' গ্রন্থে ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে কিন্তু এই 'গাহাসত্তসঈ'রই গাথা হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। তবে পিতৃব্য শ্রীরূপের মতই একটু আধটু শব্দ পরিবর্তন করেছেন—যেমন শ্রীজীব এই গাথাটি এরূপ উদ্ধৃত করেছেন—

ভূম ধম্মিঅ বীসত্থো সো সুণহো অজ্জ মারিও দেণ।
জউনাঘট্টে তম্মিং বিব্‌ভমভাঅ কুডুঙ্গ সীহেণ ॥—২।৭৫

মূলে 'জউণাঘট্টে' স্থলে 'গোলা-অড অর্থাৎ 'যমুনাঘট' স্থলে 'গোদাবরীতট' আছে।

৩১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, কবি কর্ণপূর নিজে এই প্রাকৃতের পদগুলি লেখেন নি। 'কবি কর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় অলংকারকৌস্তভ লিখিলেও উদাহরণ দিতে যাইয়া অনেকগুলি প্রাকৃত পদ তুলিয়াছেন। ঐগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার লেখা নহে। প্রাকৃত ভাষায় পদ লিখিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না' (পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ২য় সং, ভূমিকা, পৃঃ ২০)। কিন্তু এই মত যে গ্রহণীয় নয়, উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা প্রতিপন্ন হবে। কেবল অলঙ্কারকৌস্তভে নহে, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতেও (একবিংশ স্তবক) তিনি প্রাকৃতে দুটি গাথা লিখেছিলেন, দেখা যাচ্ছে।

ইধ বুন্দাবণমজ্‌ঝে ণীসংকণিসুত্তমোরমঅণিঅরো।

অলিমেত্তভুত্তকুসুমো রমণিজ্জো জামুণো কুঞ্জো ॥—২য় কিরণ

[এই বৃন্দাবনমধ্যে ময়ূর, মৃগসমূহ নিঃশঙ্কভাবে সুপ্ত রয়েছে, কুসুমে মধুপানকারী অলিদ্বারা পূর্ণ এই যমুনাকুঞ্জ রমণীয়।]

ঠিক এ ভাবেরই একটি গাথা পাওয়া যাচ্ছে। সংকেতস্থল ভয়াবহ, অতএব নির্জন—এই কথা জানিয়ে নায়িকা নায়ককে ঐ স্থানে গোপন মিলনের কথা বলছে—

দট্‌ঠূণ রুন্দ-তুণ্ডগ্‌গ-ণিগ্‌গঅং ণিঅ-সুঅস্‌স দাঢগ্‌গং।

ভাণ্ডী বিণাবি কজ্জেণ গাম-ণিঅডে জবে চরই ॥—৫।২ (বিগ্রহ)

[নিজ শাবকের বিশাল তুণ্ডাগ্র হতে দংষ্টাগ্র নির্গত দেখে শূকরী বিনা কাজেও গ্রামের নিকটস্থ যবক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

ইঙ্গিতে সখীরা কৃষ্ণকে রাধার সঙ্গে মিলনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এভাবে—

গোউলমহিন্দণন্দণ সুঅ ঘরে এত্থ মা পবিস।

অজ্জ সহীএ সামী গোমী দূরং গও গোট্‌ঠং ॥—৩য় কিরণ

[হে গোকুলমহেন্দ্রনন্দন, শূন্য ঘরে ঢুকো না, আজ সখীর স্বামী দূরে গোষ্ঠে গেছেন।]

এর সঙ্গে সহজেই নিম্নোক্ত গাথাটি তুলনা করা যেতে পারে—

বহল-তমা হঅ-রাঈ অজ্জ পউত্থো পই ঘরং সুণ্ণং।

তহ জগ্‌গেসু সঅজ্জিঅ ণ জহা অম্‌হে মুসিজ্জামো ॥—৪।৩৫ (অভব)

[হতরাত্রি গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন, স্বামীও আজ প্রবাসে গিয়েছে, (আমার) ঘর শূন্য—হে প্রতিবেশী, তেমনভাবে জেগে থেকো, যেন আমাদের (ঘরে) চুরি না হয়।]

গাথাটিতেও নায়িকা স্বয়ংদূতী হয়ে নায়ককে গোপন মিলনে আহ্বান জানাচ্ছে। একটিতে উপজীব্য রাধা ও কৃষ্ণ, আর অন্যটিতে লৌকিক নরনারী।

পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের হৃদয়বিনিময়ের সুন্দর ভাব প্রকাশ পেয়েছে কবি কর্ণপূরের এই প্রাকৃত গাথাটিতে—

দট্‌ঠূণ তস্‌স বঅণং কৃখণমেত্তেণ কৃখু হারিঅং হিঅঅং।

এব্বং বিঅ অচ্চরিঅং তুরিঅং লদ্ধং অ তদ্ হিঅঅং ॥—৩য় কিরণ

[তার মুখ দেখে ক্ষণমাত্রেই আমি হৃদয় হারালাম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমিও ঐরূপে অবিলম্বে তার হৃদয় পেলাম।]

এরূপ ভাবের একটি গাথা গাহাসত্তসঈতে মিলে—তুলনা করুন—

পরিওস-বিঅসিএহিং ভণিঅং অচ্ছীহিঁ তেণ জণ-মজ্‌ঝে।

পডিবণ্ণং তীঅ বি উব্বমন্ত-সেএহিঁ অঙ্গেহিং ॥—৪।৪১

[অনেক লোকের মধ্যে সে (নায়ক) তার পরিতোষফুল্ল চোখ দিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিল, সেও (নায়িকাও) তার নিষ্পতৎ-স্বেদজলবিশিষ্ট অঙ্গ দ্বারা সেই (অভিমত) অঙ্গীকার করে নিয়েছিল।]

কেবল যে প্রাকৃত পদরচনায় গাথাগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা নয়, অলংকারকৌস্তভের বেশ কিছু সংস্কৃত শ্লোকরচনাতেও গাথাগুলির ভাবদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে। অলংকারকৌস্তভের এই শ্লোকটি—

ধন্যাস্তাঃ সখি ভাবিন্যঃ স্বপ্নে পশ্যতি যা হরিম্।
অভূৎ কং দোষমালক্ষ্য নিদ্রাঽপি বিমুখী মম ॥—৫ম কিরণ

[হে সখি, তারাই ধন্য, যারা হরিকে স্বপ্নে দেখে। আমার কোন দোষ দেখে যে নিদ্রা বিমুখ হয়েছে।]

নিম্নোক্ত গাথাটিরই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত সংস্কৃত রূপ বলা চলে—

ধণ্ণা তা মহিলাও জা দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছন্তি।
ণিদ্দ ব্বিঅ তেণ বিণা ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং ॥—৪।৯৭

[যারা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দেখে, সেই মহিলারা ধন্য। তার বিরহে (আমার) নিদ্রাই আসে না, কে স্বপ্ন দেখবে ?]

ঠিক এই গাথাটিরই ভাবালম্বনে লিখিত ধন্য নামে একজন কবির নিম্নোক্ত শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে ও উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত করেছেন—

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ।
অস্মাকং তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ॥—পদ্যাবলী ৩২২,
উজ্জ্বল নীলমণি ১৫।১৬৯

[হে সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখে, তারা ধন্য। কিন্তু কৃষ্ণ চলে যাওয়াতে নিদ্রাও আমাদের শত্রু হয়েছে (অর্থাৎ ঘুম হয় না)।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন এর অনুবাদ করেছেন—'হে সখি! যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে কৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাঁহারা ধন্য। কিন্তু কৃষ্ণ গমন করিলে আমাদের শত্রুরূপা নিদ্রাও গমন করিয়াছে।'[৩২]

হরিদাস দাস এর অনুবাদ করেছেন—'যে সকল নারী স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহারাও ধন্য, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে পর আমাদের কিন্তু বৈরিণী নিদ্রাও দূরীভূত হইয়াছে।'[৩৩]

কিন্তু ধারণা যে আমাদের অনুবাদই অধিকতর সমীচীন। এর প্রমাণ রাধামোহন ঠাকুরের এই পদটি—

যো ধনি সপণে নাহ মুখ হেরই
সো পুণবতি ব্রজমাঝ।
ধনি ধনি তাক সফল বরু জীবন
দেহ গেহ তছু কাজ ॥

৩২। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পদ্যাবলী (বহরমপুর সং), পৃঃ ৩০৬।

৩৩। হরিদাস দাস সম্পাদিত উজ্জ্বলনীলমণি (হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ), পৃঃ ৫০৯।

সজনি নিন্দ বৈরিণি মুঝে ভেল।
যো দিন অবধি ছোড়ল ব্রজনন্দন
তাকর সঙ্গহি গেল ॥
শয়নক সাধ বাদ করু যো বিধি
সো বিপরিত মতি মন্দ।
সহজে অভাগিনী মোহে পুন বঞ্চই
দরশনে ও মুখচন্দ্র॥
কৈছনে ঐছন দরশন পাইয়ে
সুন্দর বিদগধ শ্যাম।
রাধামোহন পঁহু কঠিন উজাগর
তিল এক নহত বিরাম॥

উপরোক্ত শ্লোকের অনুসরণে রাধামোহন ঠাকুর পদটি লিখেছেন। পদটিতে দেখা যাচ্ছে—উনি আমাদের কৃত অর্থের মতই লিখেছেন—'সজনি নিন্দ বৈরিণি মুঝে ভেল।' রাধা-মোহন ঠাকুর সুসংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মত সংস্কৃতে পণ্ডিত ব্যক্তির অর্থবোধে ভ্রান্তি ঘটেছে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না।

বীরচন্দ্র গোস্বামী পদ্যাবলীর 'রসিকরঙ্গদা' নামে একটি টীকা করেছিলেন। তিনিও এই শ্লোকের টীকাতে যা লিখেছেন তা আমাদের কৃত অর্থকেই সমর্থিত করে। টীকাটী এই—'অথ ধন্যস্য পদ্যেন তস্যা নিদ্রাক্ষয়দশাং বর্ণয়ন্ বিরহাধিক্যং দর্শয়তি যা ইতি। হে সখি বিশাখে যা যোষিতঃ প্রিয়াঃ স্বপ্নে নিদ্রাবস্থায়াং প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্তি তা এব ধণ্যাঃ পুণ্যবত্যঃ যেন পুণ্যবলেন তত্র সত্যামপি প্রিয়দর্শনং প্রাপ্নুবন্তি। অস্মাকন্তু তৎ পুণ্য-গন্ধোঽপি নাস্তি। অতঃ কৃষ্ণে গতে সতি নিদ্রাপি বৈরিণী মম তাপিকা সতী গতা কথং জীবামিতি ভাবঃ।'[৩৪] রামনারায়ণ বিদ্যারত্নও পরে তাঁর সম্পাদিত উজ্জ্বলনীলমণিতে (শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে) 'যথা পদ্যাবল্যাং' বলে ধৃত এই শ্লোকটির অনুবাদ আমাদের অনুবাদেরই মত করেছেন—'সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নযোগে প্রিয়তমকে দর্শন করে তাহারাই ধন্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর, আমার প্রতি নিদ্রা বৈরিণী হইয়া যে গমন করিয়াছে, আর সে পুনর্বার আসিল না।'

অবশ্য রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত পদ্যাবলীর পূর্ব অনুবাদটি ও হরিদাস দাসের অনুবাদটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অন্ততঃ এরূপ অর্থবোধই করে ঘনশ্যামদাস নিম্নোক্ত পদটি লিখেছেন মনে হয়। এই ঘনশ্যাম সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস দাস কবিরাজের পৌত্র হবেন।[৩৫] পদটি এই—

৩৪। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পদ্যাবলী (বরহমপুর সং) পৃঃ ৩০৬।
৩৫। ডঃ শুকদেব সিংহ—শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য, মুখবন্ধ, পৃঃ ৮/০।

সজনি এ দুখ কহিতে নাহি ঠাঞি।
বিরহ পয়োধি হেরি হিয় চমকাই
নিশি দিশি জাগিয়া পোহাই॥
সো সব নারি ভাগি করি মানিয়ে
স্বপনে হেরই নিতি কান।
হাম দুখিনী দুখ সহই না পারই
অবিরত ঝরত নয়ান।
যো হাম নিন্দ বৈরি করি তেজল
কানুক দরশন লাগি।
সো যব যতনে নিকট নাহি আয়ত
অতয়ে সে মানি অভাগী॥
অবিরত দহই হৃদয় মদনানল
কি ভেল পাপ পরাণ।
পিরীতি বিয়োগ ঐছে দুখ জানবি
ঘনশ্যাম দাস পরমাণ॥

ঘনশ্যামদাসের যো হাম নিন্দ বৈরি করি তেজল" ইত্যাদি রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত প্রথম অনুবাদটি এবং হরিদাস দাস কৃত অনুবাদটিরই তুল্য অর্থ বহন করে। ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ ও রাধামোহন ঠাকুর দুজনেই সংস্কৃতে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের দুজনের অর্থগ্রহণে ভুল না হবারই কথা। সুতরাং দুটি ব্যাখ্যাই সংগত মনে করা যায়। তবে গাথা ও কবি কর্ণপুরের শ্লোকের আলোকে রাধামোহন ঠাকুর কৃত তথা আমাদের কৃত অর্থই অধিকতর কাব্যসুষমাযুক্ত মনে করি। আধুনিক কালের কোন গবেষক শ্লোকটির দুপ্রকার অর্থ যে সম্ভব এটি উপলব্ধি করতে না পেরে রাধামোহন ঠাকুর তাঁর পদে মূল শ্লোকের কাব্যসৌন্দর্য যথাযথ রাখতে পারেন নি বলে মন্তব্য করেছেন—'ধ্রুবপদটিতে শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে সখি, নিদ্রা আমার শত্রু হইয়া বসিল, যেদিন হইতে ব্রজনন্দন ব্রজভূমি ছাড়িয়া গিয়াছেন সেইদিন হইতে নিদ্রাও তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে অর্থাৎ আমাদের সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়াছে। এখানে শ্লোকের অনুসরণ আছে সত্য, কিন্তু একটি অতি গূঢ় কথা বাদ পড়িয়াছে। শ্লোকে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বলিয়া শ্রীরাধার কাছে নিদ্রা পূর্ব হইতেই শত্রু। সেই শত্রু শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিয়া গিয়াছে এই কথাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন। পদে কিন্তু যাহা বুঝান হইয়াছে তাহা এইরূপ যে, নিদ্রা শত্রুতা করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে রাধামোহনের পদটি কিছু কাব্যসুষমা হারাইয়াছে।'[৩৬] কিন্তু এই মন্তব্য যে সমীচীন নহে, তা আমাদের আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে। উক্ত গবেষক এই আলোচ্য শ্লোকের অনুবাদ করেছেন নিম্নরূপ—

৩৬। ঐ, পৃঃ ৩৯২

যে সকল নারী স্বপ্নে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাঁহারা ধন্য। শ্রীকৃষ্ণের (মথুরায়) গমন করার পর আমাদের (প্রিয় মিলনের দিনের) শত্রু নিদ্রাও চলিয়া গিয়াছে।'[৩৭] এই অনুবাদের আলোকে রাধামোহন ঠাকুরের পদটি বিচারের জন্য তাঁর এরূপ ভ্রান্তি হয়েছে ধারণা। যাই হোক, রাধার এই মর্মস্পর্শী বেদনা ফোটাতে গিয়ে এত কথা পদকর্তাদ্বয় বলেছেন, অথচ গাথার স্বল্পপরিসরে সংহতভাবে কেমন সুন্দর বিরহিণী নায়িকার মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে। গাথার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 'ধন্য' কবি লিখেছেন, ধন্য কবির প্রেরণায় পদকর্তারা লিখেছেন, মূল উৎস তো গাথাকার 'মলয়শেখর'। তাঁর ঋণ তো অনস্বীকার্য। এভাবেই গাহাসত্তসঈর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা যে বহু পদের জনয়িতা তা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রতিপন্ন হবে।

অলংকারকৌস্তুভের অপর একটি শ্লোকে আছে—কৃষ্ণের ফিরে আসার বেশী দেরী নেই, একথা বিয়োগকাতর রাধাকে জানাবার জন্য সখীরা গৃহভিত্তিতে লিখিত অবধিদিবস গোপনে এসে মুছে দিয়ে যেত এবং এভাবেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা পেত—

> সার্দ্ধং যন্নিজদৈবতেন ন গতং দৌরাত্ম্যমেতদ্ধি বো
> জানীতাবধিবাসরঞ্চ গণনাগম্যোঽস্তি লেখাসু যঃ।
> ইত্যাকর্ণ্য বিযুক্তগোপসদৃশঃ প্রাণৈঃ সমং সঙ্কথা-
> মৈকৈকাং প্রতিবাসরং প্রিয়সখী রেখাং রহো লুম্পতি ॥—৫ম কিরণ

[তোমরা নিজ দেবতার মথুরাগমনকালে তার সঙ্গে যাওনি, ইহাই তোমাদের অতি দৌরাত্ম্য, তার যে অবধিদিবস ভিত্তিতে রেখাঙ্কিত হয়ে গণনাগম্য হয়ে রয়েছে, তাও তোমরা জান। বিয়োগিনী গোপসুন্দরীর এ সকল কথা শুনে প্রিয়সখীরা শঙ্কিতমনে প্রতিদিন গোপনে এসে ভিত্তিস্থিত এক একটি রেখা মুছে যেত।]

নিম্ন গাথাটিরই ভাবপ্রেরণা এই শ্লোক রচনার মূলে সক্রিয় মনে হয়—

> ওহি-দিঅহাগমাসংকিরীহিঁ সহিআহিঁ কুড্ডলিহিআও।
> দো তিণ্ণি তহিং বিঅ চোরিআএঁ রেহা পুসিজ্জন্তি ॥—৩১৬ (পুণ্যভোজক)

[(প্রিয়তমের) প্রত্যাগমনের অবধি দিবস নিকটবর্তী আশঙ্কা করে সখীগণ (গৃহকুড্যে) লিখিত (দিবসগণনা) রেখার দুই তিনটিকে অলক্ষ্যে পুঁছে রেখেছে।

মানিনী রাধার পদপ্রান্তে কৃষ্ণ পতিত হয়ে অনুনয় করতে থাকলে রাধা বলছে—

> কিং পাদান্তমুপৈষি নাস্মিকুপিতা নৈবাপরাদ্ধো ভবান্
> নির্হেতুর্ন হি জায়তে কৃতধিয়াং কোপোঽপরাধোঽথ বা।
> যোগ্যা এবহি ভোগ্যতাং দধতি, তন্মানৌচিতো কাপি নৌ
> তেনাদ্যাবধি গোকুলেন্দ্রতনয়। স্বাতন্ত্র্যমেবাস্তু তে ॥—৫ম কিরণ[৩৮]

৩৭। ঐ, পৃঃ ৩৯০

৩৮। কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১০ম অঙ্ক) থেকে এই শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। এরূপ আরও কয়েকটি শ্লোক ঐ নাটক থেকে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে, দেখা যাবে।

[কেন আমার পায়ে পড়ছ, আমি ত কুপিতা হই নি। তুমিও কোন অপরাধ কর নি। অকারণে সুবোধজনের কখনও কোপ অথবা অপরাধ জন্মে না। তোমার যোগ্যাই তোমার ভোগ্যা হতে পারে। আমাদের এ প্রণয়বিচ্ছেদে কোনরূপ অনৌচিত্য দেখছি না। হে গোকুলেন্দ্রতনয়, তুমি আজ থেকে নির্বিঘ্নেই স্বাধীনতা ভোগ কর।]

ঠিক অনুরূপভাবেই প্রণয়কুপিতা গাথার নায়িকা কৃতাপরাধ নায়ককে বক্রোক্তি করে বলছে—

অজ্জঅ ণাহং কুপিআ অবউহসু কিং মুহা পসাএসি।
তুহ মন্নু-সমুপ্পাঅএণ মজ্ঝ মাণেণ বি ণ কজ্জং ॥—২।৮৪ (মৃগাঙ্ক)

[হে অজ্ঞ, আমি (তোমার উপর) কুপিত হই নি। (আমাকে) আলিঙ্গন কর; কেন আমাকে বৃথা প্রসন্ন করতে চাচ্ছ? (আমার পক্ষেও) তোমার কোপ উৎপাদনকারী মান অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই।]

কবি কর্ণপুর অলংকারকৌস্তুভে রাধাকৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক অনেকগুলি শ্লোকরচনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হল—

ত্বং মে প্রাণাঃ কথমিব বিভো ত্বাং বিনা নৈব বর্তে
নাহং যা তে বসতি হৃদয়ে সৈব তে প্রাণহেতুঃ।
ত্বং মে নিত্যং বসসি হৃদয়ে না ন নেত্যশ্রুপূর্ণাং
কৃষ্ণো দোর্ভ্যাং হৃদি বিনিদধে সা বিসস্মার বামম্ ॥—৫ম কিরণ

[প্রিয়তমে, তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ। হে বিভো, কিরূপে প্রাণস্বরূপ হলাম? তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না। না, আমি নই। যে তোমার হৃদয়ে বাস করে, সেই তোমার প্রাণহেতু। কেন তুমিই তো আমার হৃদয়ে সর্বদা বাস কর। না না, আমি বাস করব কেন? এই বলে অশ্রুপূর্ণা হলে কৃষ্ণ বাহু দিয়ে (রাধাকে) হৃদয়ে ধারণ করল, মানিনীও সমস্ত অভিমান ভুলে গেল।]

এ জাতীয় শ্লোকগুলির আদর্শস্থল নিম্নোক্ত গাথাটি যদি বলা যায়, তাহলে কোন অযৌক্তিক বলা হবে না মনে করি—

পসিঅ পিএ কা কুবিআ সুঅণু তুমং পর-অণম্মি কো কোবো।
কোহু পরোণাহ তুমং কীম অপুন্নাণ মে সত্তী ॥—৪।৮৪ (কুবিন্দ)

[হে প্রিয়ে, প্রসন্ন হও। কে কুপিত হয়েছে? সুতনু, তুমি। পরজনের প্রতি কোপ কিরূপ? ওগো, পর কে? হে নাথ তুমিই (পর)। কেমন করে (এ সম্ভবপর) আমার অপুণ্যের শক্তি (তাদৃশ)।]

চাঁদকে অপূর্বসৃষ্ট রমণীর মুখলাবণ্যের তুল্য করার জন্য বিধাতা নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে, এরূপ বর্ণনা এই শ্লোকে রয়েছে—

নষ্টো নষ্টঃ প্রতিকুহু মুহুঃ পূর্ণতামেতি চন্দ্রো
রাকাং রাকাং প্রতি ন তু ভবেদস্বরূপ কদাঽপি।

নান্যো হেতুস্তদিহ ললিতে বীক্ষ্য বীক্ষ্য ত্বদাস্যং
নূনং ধাতা তমতিচতুরো নির্ম্মিমীতেঽনুমাসম্ ॥—৮ম কিরণ

[চাঁদ প্রতি অমাবস্যায় নষ্ট হয়ে আবার প্রতি পূর্ণিমায় পূর্ণতা পাচ্ছে। কোন অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় অন্যরূপ পায় না। হে ললিতে, এ বিষয়ে অন্য কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। সুচতুর বিধাতা নিশ্চয়ই তোমার মুখমণ্ডল দেখে তার অনুরূপ নির্মাণের জন্য প্রতি মাসে পূর্ণ চাঁদ নির্মাণ করে।]

শ্লোকটি স্পষ্টভাবেই নিম্নোক্ত গাথাটির ভাবানুসরণে লেখা দৃঢ় অনুমান করতে পারি—

তুহ মুহ-সারিচ্ছং ণ লহই ত্তি সংপুণ্ণ-মণ্ডলো বিহিণা।
অন্নমঅং ব্ব ঘডইঅং পুণো বি খণ্ডিজ্জই মিঅঙ্কো ॥—৩।৭ (রাজহস্তী ?)

[(চাঁদ আজও) তোমার মুখতুল্য হতে পারল না এই কারণে বিধাতা সম্পূর্ণমণ্ডল চাঁদকেও পুনর্বার অন্যপ্রকারভাবে নির্মাণ করার অভিপ্রায়ে (এক এক কলা করে) তাকে খণ্ডিত করে থাকে।]

অলংকারকৌস্তুভের আর একটি শ্লোক নিম্নলিখিতরূপ—

বপুঃ স্থিত্যা জ্ঞাতং কপটরহিতং প্রেম নহি মে
সতি প্রেম্নি প্রায়ো ন ভবতি বিয়োগঃ প্রণয়িনোঃ।
অতঃ প্রেম্নোঽকীর্তিপ্রকটননিমিত্তা মম জনিঃ
কথং নু শ্রোতব্য দয়িত ইতি ভূয়ো হরিবচঃ ॥—৮ম কিরণ

[শরীর যখন বর্তমান, জানলাম আমার প্রেম কপটতাশূন্য নয়। প্রেমসত্ত্বেও কি প্রণয়িযুগলের বিয়োগ হয় ? ফলতঃ, প্রেমের অকীর্তিবিস্তারের জন্য আমার জন্ম হয়েছিল। অয়ি দয়িতে, এই হরির সম্বোধন বাক্য আর কি শুনব ?]

এর অনুপ্রেরণামূল যে এই নিম্নোক্ত গাথাটি, তাতে কোন সন্দেহ নেই—

কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মানুসে লোএ।
অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোওস্মি কো জিঅই ॥—২৪ (রোম)

[হে মামি, মানুষের জগতে কৈতবশূন্য প্রেম যেন একেবারেই নেই। যদি থাকত, তাহলে কি কারো বিরহ থাকত ? বিরহ (কদাচিৎ) ঘটলেও কেউ কি জীবিত থাকত ?]

কৃষ্ণের উদাসীন আচরণে ললিতা অনুযোগ করে বলছে—

একস্মিংস্তব হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রসূনো ভূয়স্যো নলিনদৃশঃ কৃতপ্রবেশাঃ।
নাস্ত্যস্মিন্নবসর এব গাঢ়পূর্ণে তাদৃশ্যো গুণবহুলাঃ কথং বিশন্তু ॥—৮ম কিরণ

[হে ব্রজেন্দ্রকুমার, তোমার একমাত্র হৃদয়ে বহু রমণীর প্রবেশ ঘটেছে, অণুমাত্রও স্থান নেই। সুতরাং ঐ গাঢ়পূর্ণস্থলে গুণসম্পন্না সখীর প্রবেশ কি করে ঘটবে ?]

এর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে এই গাথাটি—

মহিলা-সহস্স-ভরিএ তুহ হিঅএ সুহঅ সা অমাঅন্তী।
দিঅহং অণন্ন-কম্মা অঙ্গং তণুঅং পি তণুএই ॥—২।৮২ (হাল)

[হে সুভগ, মহিলাসহস্রপূর্ণ তোমার হৃদয়ে সে (আমার সখী) স্থান না পেয়ে, প্রতিদিনের অন্য কাজ বাদ দিয়ে তার কৃশ শরীরকে আরও কৃশ করছে।]

মানিনীর মুখে এসে পড়েছে কর্ণাভরণ ইন্দ্রনীলমণির প্রভাযুক্ত চাঁদের আলো। দয়িত তা অশ্রুকণা ভেবে পুঁছে দিচ্ছে—

পুসিআ অগ্ণাহরণেন্দনীল-কিরণাহআ সসি-মঊহা।
মাণিণি-বঅণম্মি সকজ্জলংসু-সঙ্কাই দইএণ ॥—৪।২ (কলসগন্ধ)

[প্রিয় (দয়িত) মানিনীর সুখে কর্ণাভরণস্থিত ইন্দ্রনীলমণির প্রভাযুক্ত চন্দ্রকিরণকে কাজল মিশ্রিত অশ্রুকণা মনে করে পুঁছে দিচ্ছে।]

ঠিক যেন এই গাথারই অনুসরণে কবি কর্ণপূর লিখেছেন—

কপোলয়োঃ কুণ্ডলপদ্মরাগময়ূখবিম্বং ব্রজরাজসূনোঃ।
স্বচুম্বনলগ্নাধররাগবুদ্ধ্যা স্ববাসসা লুম্পতি কাঽপি মুগ্ধা ॥—৮ম কিরণ

[ব্রজরাজকুমারের কপোলযুগলে কুণ্ডলস্থিত পদ্মরাগমণির কিরণছায়া প্রতিফলিত হওয়ায় কোনও মুগ্ধা রমণী স্বকীয় চুম্বনলগ্ন অধররাগ মনে করে বস্ত্র দ্বারা পুঁছে দিচ্ছে।]

ফুলের রেণু চোখে পড়েছে গোপী এই ভাবের অভিনয় করাতে মুকুন্দ রেণু মুছে দেওয়ার ভাণ করে গোপীর মুখচুম্বন করছে, এরূপ বর্ণনা একটি শ্লোকে আছে—

রজঃপ্রসূনস্য মমাক্ষিলগ্নমিতি ব্যাথাং কাঽপি তথাঽভ্যনৈষীৎ।
মুখস্য বায়ুং দদতা মুকুন্দেনোদস্য তত্তএ চ সা চুচুম্বে ॥—১০ম কিরণ

[ফুলের রেণু চোখে পড়েছে, এই বলে কোন ব্রজরমণী পীড়ার ভাণ করলে, মুকুন্দ মুখের ফুঁ দিয়ে তা দূর করে তার মুখচুম্বন করল।]

শ্লোকটি নিম্নোক্ত গাথাটির ভাবপ্রেরণায় লেখা বললে কোনরূপ অসঙ্গতি হবে না—

বাএরিণ ভরিঅং অচ্ছিং কণ্ণউর-উপ্পল-রএণ।
ফুক্কন্তো অবিইণ্হং চুম্বন্তো কো সি দেবাণং ॥—২।৭৬ (পালিত)

[বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত, কর্ণপূররূপে ব্যবহৃত পদ্মের পরাগদ্বারা পূর্ণ (নায়িকার) নয়নে ফুৎকার করতে গিয়ে, অতৃপ্ত অভিলাষে চুম্বনকারী দেবতাগণের মধ্যে কোন দেবতা হও ?]

অবশ্য গীতগোবিন্দেও অনুরূপ ভাববাহী শ্লোক আছে—

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥—গীত ১।৪৩

[কোনও নিতম্ববতী কানে কানে কথা বলার ছলে কপোলপার্শ্বে উপনীত হয়ে দয়িতের প্রেমোৎফুল্ল মুখে চুম্বন করছে।]

তবে গীতগোবিন্দের তুলনায় গাথাটির ভাবের সঙ্গে শ্লোকটির ভাবের অধিকতর সাদৃশ্য আছে, মনে করি। মানিনী নায়িকার মান ঘোচাতে গিয়ে নায়কের পাদপতন সম্ভবতঃ 'গাহাসত্তসঈ'তে প্রথম সূচিত হয়েছে ধারণা। সখী নায়িকাকে বলছে—নায়ক যখন পায়ে

পড়ে সাধাসাধি করছে, তখন আর মানে কাজ নেই। বেশী মানে আবার বিপরীত ঘ যেতে পারে—

পাঅ-পডিঅং অহব্বে কিং দাণিং ণ উট্‌ঠবেসি ভত্তারং।
এঅং বিঅ অবসাণং দূরং পি গঅস্‌স পেম্মস্‌স ॥—৪।৯০ (হাল)

[হে অভব্যে (অনুচিত ব্যবহারিণি), এখনও পর্যন্ত তুমি পাদপতিত ভর্তাক ওঠাচ্ছ না? অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমেরও এই (পাদপতনই) চরম সীমা।]

কবি কর্ণপূরও যেন অবিকল এই গাথারই অনুসরণে লিখেছেন—

পদান্তপতিতং রাধে পশ্য কৃষ্ণং রুষং ত্যজ।
তন্মম শ্রূয়তাং বাণী গাঢ়ো মানঃ পরং বিষম্ ॥—১০ম কিরণ

[হে রাধে, দেখ, কৃষ্ণ তোমার পায়ে পড়েছে। অতএব আমার কথা শোন, রোষ ত্যাগ কর। কেন না গাঢ় মান বিষম বিষস্বরূপ।]

যাই হোক, বাংলা দেশে হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' যে অপরিচিত ছিল না এবং বাঙালী কবিগণ যে এর ভাবপুষ্ট হয়ে কিছু কিছু শ্লোক রচনা করেছিলেন, তা উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কেবল বাংলা দেশের কবিরা নন, বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, পরে বৃন্দাবনে বসবাসকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের শাস্ত্রীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোসাঞির অন্যতম সনাতন ও শ্রীজীব যে হালের 'গাহাসত্তসঈ'-র সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সনাতন বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণীতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের প্রারম্ভ শ্লোক 'জয়তি তেঽধুনা' ইত্যাদির টীকায় 'গাহাসত্তসঈ' থেকে 'কইঅব-রহিঅ পেম্মং' ইত্যাদি (২।২৪) গাথাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং এর ভাষ্যও লিখেছেন। আর শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁর 'ভক্তিরসামৃত-শেষ' গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশে (ধ্বনিনির্ণয়) ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে দুটি গাথা (২।৭৫ ও ২।৮২) উদ্ধার করেছেন আর চতুর্থ প্রকাশে একটি গাথার প্রায় হুবহু অনুসরণে এই শ্লোকটি লিখেছেন—

মাধব নাহং দূতী প্রিয়োঽসি তস্যা স্তুমিত্যপি।
সা ম্রিয়তে তব কুযশ স্তদিদং ধর্মাক্ষরং বচ্‌মি ॥

[মাধব, আমি দূতী নই, তুমি আমার প্রিয়, তারও প্রিয়। সে মরে যাচ্ছে, তোমার কুযশ হবে, তাই এই ধর্মবাক্য বলছি।]

উপরোক্ত শ্লোকের আধার গাথাটি এরূপ—

ণাহং দূঈ ণ তুমং পিও ত্তি কো অম্হ এত্থ বাবারো।
সা মরই তুজ্‌ঝ অঅসো তেণ অ ধম্মক্খরং ভণিমো ॥—২।৭৮ (অণুলচ্ছী)

[আমি (নিজে) দূতী নই, তুমিও (তার) প্রিয় নও; সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কিছু নেই। (তবে) সে মারা যাবে, তোমারও অপযশ হবে, তাই (স্ত্রীবধনিবারণ জন্য) এই ধর্মবার্তা বললাম।]

'গাহাসত্তসঈ' থেকে স্পষ্ট উদ্ধৃতি তো দিয়েছেনই, কেবল তাই নয়, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে বিষয়বস্তু করে এঁরা যে মধুর রমণীয় কাব্য, নাটক, ভাণিকা, চম্পূ ইত্যাদি রচনা করেছেন, সেগুলিতেও 'গাহাসত্তসঈ'র গাথার ভাবছায়া কোথাও কোথাও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে। বিশেষ করে শ্রীরূপের রচনাগুলিতে গাথার ভাবছায়া বহুল দৃষ্ট হবে। 'গাহাসত্তসঈ' লৌকিক নরনারীর প্রেমগাথার সংকলন। গাথাগুলিতে সাধারণ নরনারীর প্রেমের তীব্রতা ও গভীর নিবিড়তার সুন্দর পরিচয় বিধৃত রয়েছে। এই নিবিড়তা ও তীব্রতা এমনই সার্বজনীন যে, একে রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাবনার মধ্যে স্থাপনা মোটেই দুরূহ ছিল না। বস্তুতঃ, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে তীব্র নিবিড়রূপ এঁদের রচনায় প্রত্যক্ষ করি, তা এই গাথাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুস্যূত বললে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হবে না। বিশেষ করে গাথাগুলির মধ্যে দুটি গাথার ভাবকল্পনা, প্রেমার্তির তীব্র আবেগময়তা, অপূর্ব সুন্দর রসব্যঞ্জনা রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে এবং শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমার্তির মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, এ অনুমান যদি করি, তাহলে তা অসংগত মনে হবে না। গাথা দুটির একটি এইরূপ—

জং জং পুলএমি দিসং পুরও লিহিও ব্ব দীসসো তত্তো।
তুহ পডিমা-পডিবাডিং বহই ব সঅলং দিসা অক্কং ॥—৬।৩০ (অজ্ঞাত)

[যে যে দিকে আমি তাকাই, সে সে দিকে তোমাকে সমুখে যেন চিত্রিত দেখতে পাই। সকল দিকচক্রই যেন তোমার প্রতিমাপরম্পরা বহন করছে।]

এই ভাবই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাযুক্ত সংস্কৃত কাব্যকবিতাতে, পদাবলী সাহিত্যে। এমন কি আধুনিক কালের কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ভাবেরই প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সঞ্চার ঘটেছে বললে কোন অতিরঞ্জন করা হবে না। রাধার চোখে কৃষ্ণের আকাশেবাতাসে, জলেস্থলে সর্বত্র স্ফুরণ ঘটেছে, আবার বিপরীতভাবে কৃষ্ণের চোখেও স্থাবরজঙ্গম সর্বত্র রাধার স্ফুরণ ঘটেছে এমন এক ভাবকল্পনা বহু কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে, যা গাথাটিরই ভাবের দ্বারা প্রাণিত অনায়াসে ভাবা যেতে পারে। অনুরাগের তীব্রতা থেকে কিংবা বিরহের বেদনা থেকে ত্রিভুবন তদ্‌ময় হয়ে উঠেছে, এমন দুটি অর্থই এই গাথাটি থেকে করা চলে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো স্পষ্টভাবে এরই ভাব অনুসরণে লিখেছেন—

যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরেঃ।
স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গসংহতি ॥—গোবিন্দলীলামৃত ৬।২৫

[যে দিকে যেদিকে হরির দৃষ্টি পতিত হয়, সেই সেই দিকেই তার (রাধার) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেত্রে স্ফুরিত হয়।]

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥—চৈ. চৈ. ২।৮।২৭৭-৭৮

লৌকিক নরনারীর অনুরাগের ভাব কেমন সুন্দরভাবে কৃষ্ণপ্রেমানুরাগে রূপান্তর লাভ করেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী অনুরূপ ভাবকেই অনুসরণ করে নিম্নোক্ত শ্লোকটি লিখেছেন বললে কোন অসঙ্গতি হবে না, শ্লোকটি এই—

রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী ॥—বিদগ্ধমাধব, ৫ম অঙ্ক

[সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, ভূতলে ও আকাশে (সর্বত্র) রাধাকে দেখছি, আমার নিকট ত্রিলোক রাধাময় হল কেন ?]

শ্রীজীব গোস্বামী মাধবমহোৎসবে রাধার মুখ দিয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করেছেন—

বৃন্দাটবী পুষ্পসিতাপি সখ্যঃ
সর্বত্র কৃষ্ণস্ফুরণং করোতি।
স্ফূর্তিং তদীয়ামপি কুর্বতী যা
চিত্তং সমন্তাদ্ বিতনোতি ।।—২।৩৮

[হে সখীগণ, কুসুমিত এই বৃন্দাবনে আজ সর্বত্র আমার কৃষ্ণস্ফুরণ হচ্ছে, শুধু তাই নয়, কৃষ্ণবর্ণ যাবতীয় বস্তুরই স্ফূর্তিযোগে আমার চিত্তকে অনুরঞ্জিত করছে।]

রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকেও অনুরূপ ভাবের অনুসরণ দেখা যাবে। রাধা কৃষ্ণকে বিরহকাতর হয়ে চিঠি লিখছে—

সুইরং বিজ্ঝসি বিঅঅং লম্ভইমঅণোকৃখু দুজ্জসং বলিঅং
দীসসি সঅলদিসাসু তুমং দীসই মঅণো ণ কুত্তাবি ॥—২য় অঙ্ক

[হে কৃষ্ণ, তুমি আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করেছ, কিন্তু মদনকেই অযশ পেতে হল। আমি সকল দিকে তোমাকেই দেখছি, কিন্তু মদনকে কোন স্থানে দেখতে পাই না।]

গাথার ভাবই পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে বলা যায়—

(১)

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি। (চণ্ডীদাস)

(২)

গগনে ভুবনে দশ দিকগণে
তোমারে দেখিতে পাই। (জ্ঞানদাস)

আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের—

'আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল' (ছবি, বলাকা)

কিংবা

'আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে
যতদূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে। (আত্মসমর্পণ, মানসী)

গাথাটির 'সকল দিক্‌চক্রই তোমার কত কত ছবি সাজিয়ে রেখেছে-রই অনুভূতির গাঢ় অপূর্ব কাব্যময় প্রকাশ বলা চলে।

দ্বিতীয় গাথাটি এইরূপ—

অগ্‌ঘাই ছিবই চুম্বই ঠৈবই হিঅঅম্মি জণিঅ-রোমঞ্চো।
জাআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছহ পহিও মহুঅ-উপফং ॥—৭।৩৯

[দেখ—পথিক জায়ার কপোলসদৃশ মধুক ফুলটিকে (পেয়ে)—(কখনও এর) আঘ্রাণ নিচ্ছে, (কখনও একে) স্পর্শ করছে, (কখনও একে) চুম্বন করছে, (আবার কখনও) রোমাঞ্চিত দেহে (নিজ) বুকে রাখছে।]

প্রিয়ার কপোলসদৃশ মধুকপুষ্প দেখে পথিকের উন্মত্ততার চিত্র যেরূপ গাথাকার এঁকেছেন, ঠিক অবিকলভাবে বহু কবি কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বেল রাধার কৃষ্ণের অঙ্গবর্ণসদৃশ বস্তুকে আলিঙ্গন, চুম্বন, দর্শনস্পর্শনাদির উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ততার কথা বলেছেন—

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥—গীত ৬।৭ (জয়দেব)

[(রাধা) ভ্রান্তার ন্যায় কৃষ্ণবিবেচনায় জলদবর্ণ অন্ধকারকে চুম্বন, কখনও বা আলিঙ্গন করছে।]

তমিস্রপুঞ্জাদি যদেব কিঞ্চিন্মদীয়বর্ণোপমমীক্ষ্যতে তৈঃ।
সচুম্বনং তৎ পরিরভ্যতে মদ্ধিয়া পরং তৎ ক নু বর্ণনীয়ং ॥
—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ১।৭।৯৬ (সনাতন গোস্বামী)

[তারা আমার বর্ণসদৃশ তিমিরপুঞ্জাদি যা কিছু দেখে তাকেই মদ্‌বুদ্ধিতে চুম্বন ও আলিঙ্গন করে থাকে।]

আঃ কিং বা কথনীয়মন্যদসিতে দৈবান্নবাম্ভোধরে।
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমিতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি ॥
—বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক (রূপ গোস্বামী)

[হা কষ্ট, অধিক কি বলবার আছে। দৈবাৎ যদি কৃষ্ণবর্ণ নবমেঘে দৃষ্টি পড়ে, তবে আলিঙ্গনের জন্য দুখানি পাখা পেতে ইচ্ছা করে।]

পদকর্তাদের বহু পদেও দিব্যোন্মাদপূর্ণ রাধার এই চিত্র পরিদৃষ্ট হবে—

(১)

হসিত বদনে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু হাত তুলি ॥
একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরিখণে। (চণ্ডীদাস)

(২)

জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে। (রাধামোহন)

(৩)

গহন বনেতে যাঞা তমালেরে কোলে লঞা
মনে মানে তোমা কৈল কোর।
অতিশয় হরিষে গাঢ় আলিঙ্গন রসে
ধনি রহে হইয়া বিভোর। (যদুনন্দন)

(৪)

ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভাণে। (জ্ঞানদাস)

রাধার এই দিব্যোন্মাদ উপরোক্ত গাথাটিরই ভাব থেকে সরাসরি কিংবা জয়দেবের মারফৎ পদকর্তাদের মধ্যে গৃহীত বলে আমাদের দৃঢ় অনুমান। এই গাথাটিতে পথিকের প্রিয়ার জন্য যে তীব্র আকুলতা, গাঢ উন্মাদনা, দুর্মর উচ্ছ্বাস, নিবিড় আবেগময়তা, খরদীপ্ত অনুরাগ ও মর্মছিন্ন কাতরতা দেখা যায়, তাকে পদকর্তাদের অঙ্কিত কৃষ্ণ-প্রেমাতুর রাধার অনলদহনদাহন হৃদয়ার্তির মধ্যে স্থাপনা অনায়াসসাধ্য। একটি নাম-চিহ্নযুক্ত অন্যটি নামচিহ্নবর্জিত—এ ছাড়া দুইয়ের প্রেমের গভীরতা ও আর্তিপ্রকাশে বস্তুতঃ কোন পার্থক্যই দেখি না। এই গাথাটিতে সাধারণ মানবমানবীর প্রেমের যে গাঢরক্তিম চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়, অনবদ্য। প্রিয়বিয়োগবিচ্ছেদকাতর পথিক প্রিয়ার কপোলসদৃশ মধুক ফুলটি দেখে যেরূপ অনুরাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এমনটি আর ইতিপূর্বে গোচর হয় নি। এই উন্মত্তভাবই ধারণা যে, পরবর্তীকালে কৃষ্ণপ্রেমাতুর শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মত্ত চিত্র অঙ্কনে প্রত্যক্ষভাবে, যদি তা নাও হয়, পরোক্ষভাবে ত বটেই, সুনিশ্চিতভাবে কবিদের প্রাণিত করেছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপূরের অঙ্কিত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের ছবিটি এই গাথার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমাদের অনুমান অযৌক্তিক মনে হবে না। কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদপূর্ণ চিত্রটি এঁকেছেন এইরূপ—

মদমুদিতময়ূরকণ্ঠকাণ্ডদ্যুতি-
মভিবীক্ষ্য কুতশ্চিদপ্যকস্মাৎ।
স্খলতি লুঠতি বেপতে বিধৌতি
দ্রবতি বিষীদতি হন্ত মূর্ছতীশঃ॥—৯ম অঙ্ক

[ভগবান গৌরচন্দ্র, মদমত্ত ময়ূরগণের কণ্ঠশোভা অকস্মাৎ কোন স্থানে দেখে ভূতলে স্খলিত, ভূলুণ্ঠিত ও কম্পান্বিত হন এবং কখন বা চীৎকার ধ্বনি করেন, কখন আর্দ্রচিত্ত, কখন বা বিষণ্ণও, কখনও বা মূর্ছাপন্ন হন।]

গাথার পথিকের উন্মাদনার সঙ্গে একেবারেই অভিন্ন। শ্রীচৈতন্যদেবের যে তীব্র উন্মত্তরূপ সেটাই অতিরিক্ত সংযোজিত। "গাহাসত্তসঈ" কবি কর্ণপূরের সুপরিচিত ছিল, পূর্বেই দেখিয়েছি। আমাদের আলোচ্য গাথাটির ভাষা 'অগ্ঘাই, ছিবই, চুম্বই' (আজিঘ্রতি, স্পৃশতি চুম্বতি) যেন 'স্খলতি, লুঠতি, বেপতে, দ্রবতি, বিষীদতি' ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়েছে মনে হয়। 'গাহাসত্তসঈ'র প্রভাব এক্ষেত্রে যে কি অপরিসীম আশা করি তা এর থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরূপের প্রভাব অপরিসীম। বহু পদকর্তা একেবারে আক্ষরিকভাবে শ্রীরূপের শ্লোককে অনুসরণ করে বহু পদ রচনা করেছেন। এই শ্রীরূপও যে আবার 'গাহাসত্তসঈ'র ভাবনাপুষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় তাঁর কাব্যনাটকাদির ইতস্ততঃ লক্ষ্য করা যাবে। 'হংসদূত' শ্রীরূপের প্রথম রচিত কাব্য এবং বড়ো কথা এটি বাংলাদেশেই শ্রীচৈতন্যের অনুগত হবার পূর্বেই লিখিত। বৃন্দাবনে বাসকালে সনাতন-শ্রীজীবের লিখিত গ্রন্থে 'গাহাসত্তসঈ'র স্পষ্ট উল্লেখে তাঁরা বৃন্দাবনেই এটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এমন ধারণা হয়। কিন্তু হংসদূতে গাথার ভাবছায়া দৃষ্টে স্পষ্টতঃই অনুমান করতে পারি গৌড়ের রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব করার কালে কিংবা তৎপূর্বে রূপ, হয়তো সনাতনও 'গাহাসত্তসঈ' পড়েছিলেন এবং এর তীব্ররাগময় প্রেমের গাথাগুলিকে সনিষ্ঠ আস্বাদন করেছিলেন। হংসদূত রচনার মধ্যে শ্রীরূপের কৃষ্ণপ্রাণতার পরিচয় পাই। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমবস্তুর মধ্যে লৌকিক নরনারীর প্রেমভাবনাকে উপস্থাপিত করতে শ্রীরূপ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। প্রকৃতপক্ষে মহৎভাব সকল কবিহৃদয়কেই আকৃষ্ট করে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে মানুষেরই মহৎ ভাব এবং ভাষা তাই শ্রীরূপ প্রভৃতিকে আকৃষ্ট করেছে। এই কারণেই 'গাহাসত্তসঈ'র এমন সর্বাঙ্গীণ প্রভাব (তা সে প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষ হোক) সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য তথা বাংলা পদাবলী সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে। 'গাহাসত্তসঈ'র কবিদের ধর্মনিরপেক্ষ, ব্যক্তিগত ও সমাজসম্ভব আবেগ বৈষ্ণবধর্মবোধের ঘন প্রলেপে অধ্যাত্মমহিমাযুক্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণপ্রেমে এক অলৌকিক ভাবব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে বলা যায়।

একটি গাথাতে সখীকে প্রোষিতপতিকা বলছে—

অহঅং বিওঅ-তণুঈ দুসহো বিরহাণলো চলং জীঅং।
অপ্পাহিজ্জউ কিং সহি জাণসি তং চেব জং জুত্তং ॥

—৫।৮৬ (অজ্ঞাত)

[আমি (প্রিয়ের) বিরহে কৃশা হয়েছি, বিরহের অগ্নি দুঃসহ বোধ হচ্ছে। জীবনও চঞ্চল (অর্থাৎ গমনোন্মুখ) হয়ে উঠেছে। হে সখি, যা এখন উপযুক্ত বলে তুমি মনে কর, তাই উপদেশ দাও।]

কৃষ্ণ-বিরহে রাধার বিলাপের ভাষাও আশ্চর্যজনক ভাবে অনুরূপ। রাধা বলছে—

মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ
ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ।
ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মে
পরামৃশ্যে যস্মাদ্ধৃতিকণিকয়াপি ক্ষণিকয়া ॥—হংসদূত, ১০৪

[হে সুমুখী, আমার মন সন্তপ্ত হচ্ছে এ আমি কি করব? এই সন্তাপময় বিরাট মহাসাগর পার হতে পারছি না। তোমার চরণে নতমস্তক হয়ে প্রণাম করি। তুমি শীঘ্রে কোন উপায় বলে দাও, যাতে আমি ক্ষণকালের জন্য ধৈর্য লাভ করতে পারি।]

এই ভাবসাদৃশ্য থেকে অনুমান করি যে হংসদূত রচনাকালে শ্রীরূপ 'গাহাসত্তসঈ' নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। হংসদূতের আরও দু-একটি শ্লোকে 'গাহাসত্তসঈ'র ভাবের ছায়া এরূপ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে।

হংসদূতের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটি এইরূপ—

মুহুঃ শূন্যাং দৃষ্টিং বহসি রহসি ধ্যায়সি সদা
শৃণোমি প্রত্যক্ষং ন পরিজন বিজ্ঞাপনশতম্।
অতঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহমুখি যযৌ শ্যামলরুচিঃ
স যূনামুত্তংসস্তব নয়ন-বীথী-পথিকতাম্ ॥

[হে কমলমুখী, তুমি বারংবার লক্ষ্যহীন দৃষ্টিপাত করছ, নির্জনে কারো ধ্যান করছ, প্রত্যক্ষভাবে তোমার সহচরীগণ যে সকল নিবেদন করছে, তা শুনছ না। সেই হেতু মনে করি যে, যুবকদের মুকুটমণি শ্যামল কৃষ্ণকে তুমি দেখেছ।]

একটি গাথাতেও ঠিক এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বরাগের বর্ণনা করে গাথাকার বলছেন—

পেচ্ছই অলদ্ধ-লক্খং দীহং ণীসসই সুণ্ণঅং হসই।
জহ জম্পই অফুডত্থং তহ সে হিঅঅ-ট্ঠিঅং কিং পি ॥

—৩।৯৬ (দ্বার্দ্ধেন্দ্র ?)

[যখন (তরুণী) লক্ষ্য বিনা দৃষ্টিক্ষেপ করছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে, শূন্য (অকারণ)

হাসি হাসছে এবং অস্পষ্টভাবে কি যেন আলাপ করছে, তখন (মনে হয়) তার হৃদয়ে কি যেন রয়েছে।]

শ্রীরূপ গোস্বামী গাথাকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, দৃঢ় ধারণা হয়। এই গাথার ভাবের সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত একটি পদের প্রারম্ভাংশের—

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

অবশ্য শ্রীরূপের শ্লোকাংশের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে। শ্রীরূপের 'রহসি ধ্যায়সি সদা'র সঙ্গে 'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে' মিলে। 'না শুনে কাহারো কথা' যেন 'শৃণোসি প্রত্যক্ষং ন পরিজন-বিজ্ঞাপন-শতম্'-এরই ভাষান্তর। আর 'নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে' চণ্ডীদাসের এই উক্তি সখীর 'যযৌ শ্যামলরুচিঃ স যূনামুত্তংসস্তব নয়নবীথি পথিকতাম্' এই উক্তিরই ভাবানুবাদ মাত্র।

গাথাকারের প্রত্যক্ষপ্রভাব যদি নাও থাকে, অন্ততঃ পরোক্ষ প্রভাব চণ্ডীদাসে সহজে লক্ষণীয়। গাথার ভাবই শ্রীরূপের মাধ্যমে বাহিত হয়ে চণ্ডীদাসের রচনায় অনুস্যূত হয়েছে, সন্দেহ নেই।

'গাহাসত্তসঈ'-র লৌকিক নরনারীর প্রেমগাথাকে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মহিমায় উত্তরণের প্রয়াসচিহ্ন কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে সুস্পষ্ট দেখা যাবে। মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ হালকবির একটি গাথা উদ্ধার করেছেন। অবশ্য এটি সরাসরি হাল থেকে গ্রহণ করেন নি। সনাতন গোস্বামী দ্বারা বৈষ্ণবতোষণীতে ধৃত গাথাটিকেই তিনি এখানে উদ্ধৃত করেছেন। গাথাটি এই—

কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ।
অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জিঅই॥

—২।২৪ (রাম)

[হে মামি, মানুষের জগতে কৈতবশূন্য প্রেম যেন একেবারেই নেই। যদি থাকত, তাহলে কি কারো বিরহ থাকত ? বিরহ (কদাচিৎ) ঘটলেও কেউ কি জীবিত থাকত ?]

সনাতন গোস্বামী ধৃত পাঠে 'মামি' শব্দটি নেই। তিনি যে এটি ইচ্ছাপূর্বক বাদ দিয়েছেন, তা সহজেই বোঝা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। এর প্রায় হুবহু অনুবাদ যা করেছেন, তা নিম্নরূপ—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়॥—চৈ. চ. ২।২।৪৩

'কইঅব রহিঅং পেম্মং' কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম'-এ রূপলাভ করেছে। এই শব্দপরিবর্তনের ফলে অনুবাদটিতে মূলের ভাবধারার সঙ্গে কোনও রূপ অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য ঘটে নি, অথচ কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা অনতিলংকৃত ভাষায় অপূর্ব গভীর সারল্যে প্রকাশিত হয়েছে। লৌকিক প্রেম 'কৃষ্ণ' এই একটি মাত্র শব্দের যাদুস্পর্শে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে ভক্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত অলৌকিক প্রেমের মহতী ভাবলোকে যাত্রা করেছে। বৈষ্ণব পদকর্তারাও এভাবেই 'গাহাসত্তসঈ'র প্রেমানুভূতির ভাবপ্রতিমাকে আত্মসাৎ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমাধারে উপস্থাপিত করে নিবিড় তন্ময়তায় আরও গভীর বর্ণোজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন, বিশ্বাস। 'গাহাসত্তসঈ' লৌকিক প্রেমের গাথা হলেও সেই প্রেমকে যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের আধারে স্থাপনা সহজ, তা পূর্বেই দেখিয়েছি। বস্তুতঃ, লৌকিক মানবমানবীর প্রেমের প্রতীক হিসাবেই রাধাকৃষ্ণ চিত্রিত হয়ে এসেছে বহুদিন। সেকালের কাব্যসংকলয়িতাদের কাছে রাধা ছিল নিতান্তই সাধারণা। তাই এই নিষিদ্ধ প্রেমের পাত্রীর স্থান হয়েছিল 'অসতীব্রজ্যা'তে। চৈতন্য পূর্বকালে সমগ্রভাবে সমাজমানুষের মনে কৃষ্ণপ্রাণতা তেমন করে উদ্বোধিত হয়নি। কৃষ্ণের রাখালিয়া জীবন এবং গোপবৃত্তে রাধার পরকীয়া প্রেমের লোকমধুর রুচিতেই তখনকার কবিহৃদয় উদ্বেলিত। অধ্যাত্মভাবনার স্পর্শ তখনও এ প্রণয়কাহিনীতে লাগে নি। জয়দেবের হরিপ্রাণতা নিঃসংশয়িত প্রতিষ্ঠ নয়। প্রকৃতপক্ষে, চৈতন্যভাবনাশ্রিত হয়েই আধ্যাত্মিক তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্কেত বহন করে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লৌকিকতার মর্ত্যভূমি থেকে অলৌকিকতার ভাবলোকে যাত্রা করেছে। আর এই দুই রাজ্যের সেতুবন্ধন ঘটেছে বৈষ্ণবপদকর্তাদের ভক্তিগাঢ় কবিচিত্তের আশ্চর্য সুন্দর বাঙ্‌নির্মিতিতে। আর এই বাঙ্‌নির্মাণে সুন্দরতম ভাব, ভঙ্গী, ভাষা, চিত্রকল্প যেখান থেকে যা কিছু তাঁরা পেয়েছেন, তাই-ই দু হাত পূর্ণ করে নিয়েছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকেই বিশেষ করে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ প্রভৃতি সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে এঁদের বিশেষ অধিকার ছিল। সংস্কৃতের পাশাপাশি প্রাকৃত কাব্যকবিতানাটকাদিও এঁরা পড়েছিলেন সহজেই অনুমান করা যায়। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষাপ্রসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলাদেশে কাব্যকবিতাদি পঠনপাঠনের একটা সুন্দর ইতিহাস তুলে ধরেছেন—

পড়িল কখন দণ্ডী, করিতে কবিত্ব খণ্ডী,
নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ, পড়িল ভারবি মাঘ,
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল॥
জৈমিনিভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভব।

দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু শ্বেত মুনি,
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব ॥
অব্যাহত বুদ্ধিগতি, পড়ে দুই সপ্তশতী,
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা, পড়িল বাসবদত্তা,
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী ॥[৩৯]

মুকুন্দরাম উল্লিখিত 'দুই সপ্তশতী'-র একটি 'আর্য্যাসপ্তশতী' এবং অন্যটি যে 'গাহাসত্তসঈ' তা বোঝানো যায়।[৪০] এ থেকে মধ্যযুগের বিদ্যোৎসাহী বাঙালী পাঠকের কাছে 'গাহাসত্তসঈ' অপরিচিত ছিল না দেখা যাচ্ছে। সুপণ্ডিত বৈষ্ণবপদকর্তাদেরও 'গাহাসত্তসঈ' অপঠিত না থাকবারই কথা। বস্তুতঃ, তাঁরা যে 'গাহাসত্তসঈ'-র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং পদরচনার কালে এর থেকে ভাবের কনকচূর্ণ মুঠো ভরে নিয়েছেন, তা দেখা যাবে। অবশ্য 'গাহাসত্তসঈ' থেকে এঁদের ভাবসম্পদ আহরণ যে সর্বাংশে সবসময়ে সরাসরি ঘটেছে, তা বলা চলে না। গাথার ভাব সংস্কৃত কবিতায় এবং সংস্কৃত কবিতার ভাব পদাবলীতে সঞ্চারিত হয়েছে, এমনটিও দেখা গেছে। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনাও করা গেছে। তবে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে প্রাকৃত কবিতার সাদৃশ্য কেবলমাত্র সংস্কৃত জানা কবিদের মধ্যস্থতায় একথা যাঁরা বলেন,[৪১] তাঁদের মন্তব্য যথার্থ নয়, ধারণা। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁর বহু বিষয়ে পঠন-পাঠনের পরিচয় দেয়। বিদ্যাপতির বহু উৎকৃষ্ট পদ তাঁর উচ্চ কবিশক্তির পরিচয় বহন করলেও মৌলিক ভাবকল্পনায় তা ঋদ্ধ নয়, দেখা গেছে।

৩৯। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বঙ্গবাসী কার্যালয় হতে প্রকাশিত ২য় সং, পৃঃ ২১৫। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গলে 'পড়ে দুই সপ্তশতী' পাঠ আছে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গল (ধনপতি উপাখ্যান)'-এ "জানে বালা সপ্তশতী" পাঠ আছে।

৪০। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চণ্ডীমঙ্গল বোধিনীতে এই 'পড়ে দুই সপ্তশতী'র এরূপ অর্থ করেছেন, দুই সপ্তশতী—(১) শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা ও (২) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—যাহাতে ৭০০ শ্লোক আছে অথবা (১) মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান দেশের রাজা শালিবাহন বা সাতবাহন কর্তৃক রচিত গাথাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ প্রাকৃত মহাকাব্য ও (২) গোবর্ধনাচার্য বিরচিত আর্য্যাসপ্তশতী।

৪১। "কিন্তু উচ্চতর সাহিত্যে, এমন কি বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রেমের সূক্ষ্ম চেতনা প্রবিষ্ট হইয়াছে সংস্কৃত প্রেমকবিতার পথ বাহিয়া। উহাদের সহিত প্রাকৃত কবিতার সাদৃশ্যও সংস্কৃত-জানা কবিদের মধ্যস্থতায়।"—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১

বস্তুতঃ, দেখা যাবে তাঁর অনেক পদের ভাব সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার ভাব থেকে আহৃত হয়েছে। 'কীর্তিলতা'-র রচয়িতা বিদ্যাপতি সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত সাহিত্যেরও চর্চা করেছিলেন, তা দৃঢ়তাসহকারে বলা চলে। বিদ্যাপতি 'গাহাসত্তসঈ'-র সঙ্গে যে অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, তা নিম্ন প্রমাণবলে বলা যায়। বিদ্যাপতি তাঁর একটি পদে রাধার অভিসারের এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

আজ পুনিম তিথি জানি মোয়ঁ অএলিহুঁ
উচিত তোহর অভিসার।
দেহজোতি সসিকিরণ সমাইতি
কে বিভিনাবএ পার॥

পূর্ণিমারাত্রিতে রাধার গৌরদেহের লাবণ্য জ্যোৎস্নালাবণ্যে মিশে একাকার হয়ে যাবে। ফলে কেউ তাকে আর প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনা সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই ভাবটুকু বিদ্যাপতির নিজস্ব নয় বলেই মনে করি। 'গাহাসত্তসঈ'-তে হুবহু এই ভাবের একটি গাথা পাওয়া যায়। গাথাটি এই—

গম্মিহিসি তস্‌স পাসং সুন্দরি মা তুরঅ বড্‌ঢউ মিঅঙ্কো।
দুদ্ধে দুদ্ধং মিঅ চন্দিআই কো পেচ্ছই মুহং দে॥—৭।৭

[হে সুন্দরি, প্রিয়জনের কাছে যেতে পারবে, কিন্তু ত্বরার প্রয়োজন নেই, চাঁদ আরও উঠুক, দুধে দুধের ন্যায় চাঁদের আলোতে তোমার মুখ কে দেখতে সক্ষম হবে?]

সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, বিদ্যাপতি গাথাটির ভাবের দ্বারা উপর্যুক্ত পদরচনায় প্রাণিত হয়েছিলেন। সুতরাং প্রাকৃত কবিতার সঙ্গে এঁদের যে সরাসরি পরিচয় ছিল, তা বুঝি নির্দ্বিধায় বলা চলে।

বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে :—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। গুণ ও কর্মের তারতম্য অনুসারেই নাকি ভগবান ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছিলেন[১]। গুণ বা প্রবৃত্তির সঙ্গে বর্ণ বা জাতির যোগাযোগ অনেক সময়েই আমাদের কাল্পনিক মনে হয়, তবে কর্ম বা বৃত্তির সঙ্গে আদিতে জাতিভেদের সম্পর্ক ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। স্বজাতিনির্দিষ্ট বৃত্তি লঙ্ঘন করাকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংঘাতের ফল বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু বাংলা দেশের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের লোক প্রাচীন যুগ হতেই নানা কারণে তাঁদের জাতিগত বৃত্তি লঙ্ঘন করে এসেছেন, এবং সেজন্য তাঁরা সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় বা অপাংক্তেয় হন নি। এমন কি, বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে তাঁদের বর্ণান্তরও ঘটে নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "সামাজিক প্রবন্ধ" (১৮৯২) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মনুর সময় হতেই (খৃঃ পূঃ ২০০—২০০ খৃষ্টাব্দ) বৃত্তির ব্যাপারে কিঞ্চিৎ শিথিলতা আমাদের সমাজে দেখা গিয়েছিল। মনু নিজেই বিধান দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ স্বজাতিনির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ হলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা উপার্জন করতে পারে।[২] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বাংলাদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কোনদিনই ছিল না। এদেশের বর্ণ-বিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। করণ—কায়স্থ এবং অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা ও অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শূদ্র-পর্যায়ভুক্ত।[৩] কিন্তু কি ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ সব বর্ণের লোকেই প্রাচীন যুগে ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কামনা, আর্থিক উন্নতির প্রেরণা ইত্যাদি নানা কারণে তাঁদের জাতিগত বৃত্তি পরিহার করে অনেক সময় অন্য বৃত্তি বা জীবিকা অবলম্বন করেছেন। ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ ধর্মকর্মানুষ্ঠান, পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করলেও ছোট-বড় রাজকর্ম, যোদ্ধ-ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য তাঁদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি প্রয়োজন হলে তাঁরা গ্রহণ করতেন। স্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব ভট্টের (সেন-বর্মণ যুগ) তালিকায়

১. "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা", ৪র্থ অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক।

২. "ভূদেব-রচনাসম্ভার", প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৬৪ সন), পৃঃ ১৮৭। মনু, ১০।৮০-৮২, ১০১-১০২ ; ৯।৩১৯।

৩. নীহাররঞ্জন রায়, "বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ" (কলিকাতা, ১৩৫২ সন), পৃঃ ৪২-৪৪। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু-ও এই মতের সমর্থক ; "ভারতকোষ", তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩ দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণদের নিষিদ্ধ কর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে—শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা ও তাঁদের পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা এবং চিত্রাঙ্কনের মতো শিল্পবিদ্যা।[৪] বিশুদ্ধ জ্ঞান বা অধ্যাত্মজ্ঞান চর্চার তুলনায় ব্যবহারিক জ্ঞান চর্চার স্থান নিম্নে ছিল বলেই বোধ হয় গণক বা গ্রহবিপ্রেরা ব্রাহ্মণ-সমাজে পতিত ছিলেন, এবং চিকিৎসা প্রধানতঃ যাঁদের বৃত্তি ছিল সেই অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরাও ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানে শূদ্র বলে গণ্য হতেন। ডঃ রায় দেখিয়েছেন যে পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মণ আমলে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা (প্রধানতঃ চিকিৎসক) মন্ত্রী হয়েছেন, করণ—কায়স্থেরা (প্রধানতঃ লেখক ও হিসাব-রক্ষক বা কেরানী) সৈনিক বৃত্তি ও চিকিৎসা বৃত্তির অনুসরণ করেছেন এবং কৈবর্তরা (নৌ-চালক ও মৎস্যজীবী) রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হয়েছেন, এমন কি সাহিত্য চর্চাও করেছেন। তবে সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই সে যুগে নিজেদের বর্ণ-বৃত্তির অনুশীলন করতেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।[৫] বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (খ্রীঃ ১২শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত) ব্রাহ্মণেতর যে সব জাতিকে সংকর বর্ণ বা শূদ্র বর্ণ বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে (তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, বণিক ইত্যাদি) তাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু বৃত্তি-পরিচয়ের দ্বারাই পরিচিত। বৃত্তি পরিবর্তন করলে এঁদের জাতি-পরিচয়ও এক থাকার কথা নয়। তবে এঁদের মধ্যেও যে বৃত্তি-পরিবর্তন অসম্ভব ছিল না কৈবর্ত জাতির এক অংশের পরবর্তী কালে কৃষিবৃত্তি গ্রহণ ও মাহিষ্যদের সঙ্গে অভিন্নতা-লাভই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৬] পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোনিয়ার উইলিয়ামসের মতে এই বৃত্তি-পরিচায়িত বর্ণগুলির (trade castes) মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিধি-নিষেধগুলি কঠোর ভাবে পালন করা হ'ত। এগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের শিল্পী-সংঘ বা artisans' guilds-গুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।[৭]

মধ্যযুগের ঐসলামিক রাজশক্তি প্রতিযোগিতা-বিহীন, বংশগত বৃত্তি-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না। ফলে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের স্ব-স্ব বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে স্বভাবতঃই আরো শিথিলতা দেখা দেয়। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই তখনো শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু যজন-যাজনরত মূর্খ বিপ্রেরও সমাজে অভাব ছিল না। মুকুন্দরাম তাঁর "কবিকঙ্কন চণ্ডী"তে (১৫৭৯ খ্রীঃ) কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

৪. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৭-৮।

৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭, ৫১-২, ১১৩-৪।

৬. ঐ, পৃঃ ৮৯-৯৮।

৭. M. Monier Williams, *Hinduism* (Calcutta, 1951), pp. 107-128. বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান।"[৮]

সমসাময়িক কালের মূর্খ ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও (১৪৮৬-১৫৩৩) পরাঙ্মুখ হন নি।

"প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥"[৯]

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের "হরিলীলা" পাঠে মনে হয়, ব্রাহ্মণেরা ঐ যুগে শুধু শাস্ত্রচর্চা করতেন না, অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে কিছু লোক রাজনীতি চর্চাও করতেন।

"দক্ষিণে বসিয়া বেদবক্তা দ্বিজগণ। রাজনীতি কহে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ॥"[১০]

ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল সমাজে বৈদ্য ও কায়স্থ উপবর্ণের স্থান। বৈদ্যেরা প্রধানতঃ চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত বৈদ্যের উল্লেখও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। চৈতন্য-অনুচর নবদ্বীপ-নিবাসী মুরারি গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য হলেও সর্বদা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের চর্চা করতেন। চৈতন্যদেব তাই তাঁকে পরিহাস করে বলেছেন,—

"প্রভু বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দড়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"[১১]

চৈতন্যদেবের পরিচিত বারাণসী-প্রবাসী চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য হলেও কায়স্থদের ন্যায় লিখন-বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[১২] কায়স্থ উপবর্ণের লোকেরা সাধারণতঃ মসীজীবী ও রাজকর্মচারী হলেও কখনো কখনো রাজ্যশাসনের এবং প্রজাপালনের দায়িত্বও গ্রহণ করতেন। বারভূইঞাদের মধ্যে অনেকে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, "আইন-

---

৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৫২), পৃঃ ৩৪৯।

৯. "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ৪৮।

১০. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৮৭।

১১. "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত", পৃঃ ৪৮।

১২. "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত", উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৫১ সন), পৃঃ ১৯৫।

ই-আকবরী" গ্রন্থেও বাংলাদেশে অনেক কায়স্থ রাজার নাম পাওয়া যায়।[১৩] সমাজে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ বর্ণের মর্যাদা পেলেও কায়স্থদের বৈষয়িক প্রতিপত্তি বোধ হয় বেশীই ছিল। ইচ্ছা মতো বৃত্তি গ্রহণের এই স্বাধীনতা অবশ্য মধ্যযুগেও কিছুটা সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সন্তান মুচি-হাড়ি-ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অথবা কোনো শূদ্র যজন-যাজন, পৌরোহিত্য করছেন এরকম দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে, অন্ততঃ বর্ণাশ্রমী সমাজে, পাওয়া যায় না। যজন-যাজন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য থাকার জন্যই বোধ হয় সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হতেন।

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলা দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি কখনো ছিল না, যদিও পরবর্তীকালের কোনো কোনো গ্রন্থে কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করা হয়েছে। মুকুন্দরামের কাব্যে বাংলা দেশে 'ক্ষত্রি' ও রাজপুত জাতির উল্লেখ করা হয়েছে যাদের বৃত্তি ছিল মল্ল-বিদ্যা শিক্ষাদান, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি। কিন্তু মুকুন্দরাম ক্ষত্রিয় রাজপুতদের স্থান শূদ্র কায়স্থদের নিম্নে নির্দেশ করেছেন। এ বিষয়ে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"তে ভাঁড়ুদত্তের প্রতি কালকেতুর উক্তি স্মরণীয়—

"হয়্যা বেটা রাজপুত বোলহ কায়স্থ-সুত
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।"[১৪]

কায়স্থেরা লেখাপড়ার কাজ করতেন বলেই কি তাঁদের এই বিশেষ সম্মান? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সে সময় অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির কার্য এদেশে প্রধানতঃ শূদ্র বর্ণের, এমন কি অন্ত্যজ জাতির করণীয় ছিল। এঁদের মধ্যে আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়। কৃষিবৃত্তি ও সামরিক বৃত্তি উভয়ের প্রতিই এঁদের সমান আকর্ষণ ছিল। বাগ্দী, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির লোকেরাও এ যুগে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।[১৫]

শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতির লোকেরা বাংলাদেশে যে শুধু সামরিক বৃত্তিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তা নয়, শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও এঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি শূদ্র জাতির লোকেরা একদিকে যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হতেন (বাংলা মঙ্গল কাব্য তার সাক্ষ্য বহন করছে), তেমনি অপর দিকে বিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থরচনার প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট

১৩. সতীশচন্দ্র মিত্র, "যশোহর-খুলনার ইতিহাস", প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৬৩), পৃঃ ৪৫৪।

১৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, "কবিকঙ্কণ চণ্ডী", পৃঃ ৩৫১, ৪৪১।

১৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), "বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ" (কলিকাতা, ১৩৭৩ সন), পৃঃ ৩০২, ৩০৫। শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, "বাঙ্গালী জাতি পরিচয়" (কলিকাতা, ১৩৬৩ সন), পৃঃ ৮৮-৯১।

অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ বণিকেরা মধ্যযুগে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মাঝি কায়েৎ, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধূপী প্রভৃতি নিম্নবর্ণজাত লোকেরা পুঁথি-লেখক বলে উল্লিখিত হয়েছেন। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন নাপিত নল-দময়ন্তীর কাহিনী বাংলা কবিতায় বর্ণনা করেছেন।[১৬] রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে তিনি বাল্যকালে (ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে) চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে যে গুরু-মহাশয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার লোক এবং জাতিতে আগুরি ছিলেন।[১৭] Adam সাহেবের বিবরণী (১৮৩৫-৩৮) থেকেও জানা যায় যে জাতিভেদ প্রথার প্রাবল্য সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় কলু, শুঁড়ি, ধোপা, মালা ও চণ্ডাল-জাতীয় গুরুমহাশয়দের পাঠশালাগুলিতে বর্ণহিন্দু ছাত্রের অভাব হ'ত না। এ কথা বোধ হয় ঐ সময় বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। Adam অবশ্য লিখেছেন যে পাঠশালার গুরুমহাশয়দের মধ্যে কায়স্থ জাতীয় লোকেরাই (ব্রাহ্মণেরা নন।) সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন।[১৮] ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী" বইতে লিখেছেন, "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনো ডোম ও বাগ্‌দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে।"[১৯] এই ব্যাপারটিকে মধ্যযুগীয় ধারার অনুকরণ বলেই গ্রহণ করতে হবে, কারণ, এই সব টোলের শিক্ষা-ক্রম পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল না। উপরের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে মধ্যযুগের শেষে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাবৃত্তি ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণের লোকেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না।

কেবলমাত্র লৌকিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নয়, পারমার্থিক জ্ঞানের রাজ্যেও নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রবেশাধিকার মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে স্বীকৃত ছিল। ঐ সময়ের বাংলা সাহিত্য থেকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন দিয়েছেন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মা তাঁকে হাড়ী-জাতীয় এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন। "শূন্যপুরাণ"-রচয়িতা ডোম-জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার পুরোহিত ছিলেন এবং নিজ অনুচরদের কাছে ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদাই পেয়েছিলেন। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর নামও বৈষ্ণব পদাবলীতে যুক্ত হয়েছে। ডঃ মজুমদার

১৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৫-৩০৬।

১৭. রাজনারায়ণ বসু, "আত্মচরিত" (কলিকাতা, ১৯৬১ ; প্রথম প্রকাশ—১৯০৯), পৃঃ ৭।

১৮. The Rev. J, Long (Ed.), *Adam's Reports on Vernacular Education In Bengal And Bihar*, (Calcutta. 1868), pp. 158-59, 164, 176.

১৯. সুকুমার সেন, "মধ্যযুগের বংংলা ও বাঙ্গালী", পৃঃ ৪৩।

ঠিকই বলেছেন, "স্মৃতি ও পুরাণের গণ্ডীর বাহিরে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি নব্যপন্থী যে সব ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সব নিম্ন জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।"[২০] অবশ্য এই বক্তব্যকেই বোধ হয় অন্যভাবে বলা চলে যে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ, যোগী প্রভৃতি নব্যপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা ও আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সমাজের নিম্নজাতির লোকেদের বিদ্রোহের ফলশ্রুতি। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেও বহু অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের মন্ত্র-গুরুর পদ গ্রহণ করেন।[২১] অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই সব নিম্ন বর্ণের লোকেদের ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে কখনো কখনো দেখা যায়। সদ্‌গোপ-জাতীয় রামশরণ পাল (নৈহাটির কাছে ঘোষপাড়া গ্রামে বাস) কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর পুত্র রামদুলাল ১৬ বৎসর বয়সে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেন। নদীয়া জেলার মেহেরপুর নিবাসী বলরাম হাড়ী (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম) বলরামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে পূজা করতেন।[২২] অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে উদ্ভূত এই সব নতুন ধর্মসম্প্রদায়গুলি অবশ্য জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকারই করেন নি, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা মুসলমানদেরও নিজেদের দলে স্থান দিয়েছিলেন।

ইসলাম ধর্ম নীতিগত ভাবে জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান সমাজে শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সামাজিক ভেদ ছাড়াও বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ ছিল বলে মনে হয়। এই ব্যবস্থাকে মুসলমান সমাজের উপর হিন্দু সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বলে মনে করা যেতে পারে। অথবা এ-ও সম্ভব যে স্থান-বিশেষে কোনো বিশেষ জাতির লোকেরা ধর্মান্তরিত হবার পরেও জাতিগত বৃত্তিকে আশ্রয় করে ছিল। মুকুন্দরামের "কবিকঙ্কন চণ্ডী"-তে এই ধরণের কয়েকটি ইসলামী জাতির নাম পাওয়া যায়, যথা—জোলা (তাঁত বয়নকারী), পিঠারি (পিঠা-বিক্রেতা), কাবাড়ি (মৎস্য-বিক্রেতা), হাজাম (সুন্নৎকারী), কাগজী (কাগজ প্রস্তুতকারক), রঙ্গরেজ (রঙের কাজ করে), কসাই (গোমাংস-বিক্রেতা) ইত্যাদি।[২৩] তবে এই শ্রেণীভেদ সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক ছিল কি না সঠিক জানা যায় না। "চৈতন্যভাগবত" পাঠে মনে হয় যে এদেশের

২০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৫।

২১. ক্ষিতিমোহন সেন, "জাতিভেদ", (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ সন), পৃঃ ১৪২।

২২. H. H. Wilson, *Essays And Lectures Chiefly On The Religion Of The Hindus*, (London, 1862), Vol. I. pp. 171-72.

অক্ষয়কুমার দত্ত, "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়", প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৮৮৮), পৃঃ ২১৮-২০।

২৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪৫-৪৬।

মুসলমানদেরও ব্রাহ্মণদের মতো প্রবল জাতিগর্ব ছিল (রাজার জাতি হিসাবে তা অস্বাভাবিক নয়!), এবং ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি তাঁরাও কিছু কিছু জাতিগত আচার পালন করতেন। যবন হরিদাসের হিন্দু বা বৈষ্ণবসুলভ আচার সংশোধনের জন্য মুসলমান 'মুলুকপতি' তাঁকে তিরস্কার করে বলেছেন,—

"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দু দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বল পাইবে নিস্তার ॥"[২৪]

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন যে সাম্প্রতিককালেও বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে (যথা, বীরভূম) মুসলমানেরা হিন্দু গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন না, যদিও দই চিঁড়া অথবা ঘৃতপক্ক খাদ্য গ্রহণে তাঁদের বিশেষ আপত্তি ছিল না।[২৫]

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ইংরেজ রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সেই আদি যুগের কলকাতাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। একটি বহুপ্রচলিত বাংলা ছড়া আছে যে কায়স্থ, পিরালী (ব্রাহ্মণ), তন্তুবায় ও সুবর্ণবণিকেরাই কলকাতা শহর গড়েছিলেন। কায়স্থদের মধ্যে হাটখোলার দত্ত, কুমারটুলির মিত্র ও শোভাবাজারের দেবেরা, পিরালীদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরেরা, তন্তুবায়দের মধ্যে শেঠ ও বসাকেরা এবং সুবর্ণবণিকদের মধ্যে ধর ও মল্লিকেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্তুবায়-জাতির শেঠ ও বসাক ব্যবসায়ীরাই বোধ হয় এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম, পলাশীর যুদ্ধেরও আগে, গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ১৭৫৭ হতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের, বিশেষতঃ কায়স্থদের, প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়, এবং এঁরাই কলকাতার বাঙালী হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অন্যভাবে বলা চলে যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র (কায়স্থ) উভয় বর্ণের লোকেই এ যুগের কলকাতা শহরে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে সমাজসৌধের শীর্ষে আরোহণ করেন। বিত্তশালী ব্যক্তি চিরদিনই সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হন, কিন্তু এই সময় হতে অর্থই আমাদের সমাজে কৌলীন্যের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই উচ্চ বর্ণের ব্যবসায়ীরাই লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ গ্রহণ করে জমিদার

২৪. "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত", পৃঃ ৮১।

২৫. ক্ষিতিমোহন সেন, "জাতিভেদ", পৃঃ ১৮৬। J. H. Hutton, *Caste In India* (Oxford University Press. 1963), p. 121.

শ্রেণীতে রূপান্তরিত হন। ব্যবসায় বাণিজ্য এর পর আবার নিম্নবর্ণের পুরাতন বণিকগোষ্ঠীর হাতে ফিরে আসে।[২৬]

উপরের আলোচনা হতে যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে আধুনিক যুগের বহু পূর্ব হতেই বাঙালী সমাজে জাতি বা বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল না, বর্ণ সব সময় বৃত্তিনির্ভর ছিল না। জাতিভেদের প্রধান সাবধানতা ছিল দুটি বিষয়ে,—প্রথম, বিবাহ-সম্বন্ধ বিচার ও দ্বিতীয়, খাদ্যাখাদ্য বিচার, সংক্ষেপে, হিন্দীতে "রোটি-বেটি"র বিচার।[২৭] হয়ত, সুপ্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণ বিভিন্ন নরগোষ্ঠির (ethnic group) লোক দিয়ে গঠিত হয়েছিল, এবং তারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়েও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই দুই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে। অসবর্ণ বিবাহ ও ব্যভিচারের ফলে কিছু কিছু রক্তের মিশ্রণ ঘটলেও মোটের উপর এই বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার প্রচেষ্টা আধুনিককালের সূচনা পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট প্রবল ছিল। জাতিভেদ প্রথার আনুষঙ্গিক স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার বহু পরিমাণে আর্য সভ্যতার উপর আর্যেতর জাতির প্রভাব বিস্তারের ফল বলেও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। এই কারণেই বোধ হয় জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা আর্যপ্রধান উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তুলনায় অনার্যপ্রধান দক্ষিণ ভারতে অনেক প্রবল।[২৮] ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা দেশে যে বৈশ্যযুগের সূচনা হয় তাতে প্রথম দিকে এই "রোটি-বেটি"র বিচার বিশেষ শিথিল হয় নি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে ধীরে ধীরে এই ব্যাপারে সমাজ-চেতনা জাগ্রত হতে থাকে ও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রকাশ্যে একত্র আহারাদি প্রচলনের সূচনা দেখা যায়। কিন্তু তার বহু পূর্বেই বৃত্তি ও বর্ণের মধ্যে যে স্বল্প সংযোগ ছিল তা অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। H. T. Colebrooke সাহেব তাঁর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Remarks On The Present State Of Husbandry And Internal Commerce Of Bengal* বই-এ লিখেছেন যে সেই সময় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্য সব বৃত্তিই সব বর্ণের লোকেদের কাছে উন্মুক্ত ছিল, যদিও কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ করা সবার কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *East India Gazetteer*-এ এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। গ্রন্থের লেখক Hamilton সাহেব লিখেছেন,—"In practice

২৬. N. K. Sinha (Ed.) *The History of Bengal, 1757-1905* (Calcutta. 1967), P. Sinha's article on "Social Change", pp. 387-392. Also, N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. II (Calcutta, 1962), pp. 220-225.

২৭. ক্ষিতিমোহন সেন, "জাতিভেদ", পৃঃ ১১৬।

২৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫-৬, ২০-২১, ৬১, ৭৩-৭৫।

little attention is paid to the limitation of castes, daily observation showing Brahmins exercising the martial profession of a Khetri, and even the menial one of a Sudra...every profession, with a few exceptions, being open to every description of persons.[২৯] তথাকথিত professional caste-গুলির মধ্যে কৌলিক বৃত্তির প্রতি আনুগত্য হয়ত কিছু বেশি ছিল, কিন্তু এঁরাও সকলে স্বজাতির ঐতিহ্য অনুসরণ করতেন না। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর তিলি জাতির অনেকে সুতা তৈরীর ব্যবসায়ে যোগদান করেন, সুবর্ণবণিকেরা কোম্পানির আমলেই বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দির কাজে পারদর্শিতা দেখান, নমঃশূদ্রেরাও সামরিক বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিজীবী হন।[৩০] উনিশ শতকের শেষ দিকে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় চণ্ডালেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী-ই ছিলেন।[৩১] কৌলিক বৃত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা, বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণগুলির মধ্যে, খুবই বিরল ছিল। এরকম একটি বিরল ঘটনার নিদর্শন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত *Calcutta Gazette*-এর পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কলকাতার কিছু বৈদ্যজাতীয় চিকিৎসক চিকিৎসা বৃত্তিকে স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এই সময় একটি সমিতি স্থাপন করেন। ঐ সমিতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে বৈদ্যজাতীয় কোনো চিকিৎসক আর সেই রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।[৩২] কিন্তু এ ঘটনাটিকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনবোধে বর্ণগত বৃত্তি লঙ্ঘনের প্রাচীন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে দিন দিন আমাদের সমাজে প্রবলতর হতে থাকে, এবং এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণের লোকেদের তুলনায় উচ্চ বর্ণের লোকেদেরই (যারা ইংরাজী শিক্ষার এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ প্রথম গ্রহণ করেছিলেন) অগ্রণী হতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় Cotton সাহেব তাঁর *Calcutta Old And New* বইএ মন্তব্য করেছেন যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে বাঙ্গালী সমাজে যে নতুন উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়েছে তাতে জাতিগত বৃত্তিভেদ বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হলেও নিম্ন বর্ণের লোকেরা তার দ্বারা খুব বেশী উপকৃত হয় নি। "The lower castes have not emancipated themselves as completely as the higher". Cotton সাহেবের বিবরণ অনুযায়ী ধোপা, ছুত্রি,

২৯. W. Hamilton, *The East India Gazetter* (London, 1828), Volume 1. p. 208.

৩০. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, "বাঙ্গালী জাতি পরিচয়," পৃঃ ৫০, ৫৮, ১৩৮-১৩৯।

৩১. R. Carstairs, *Human Nature In Rural India* (London 1895). p. 57.

৩২. A. C. Dasgupta (Ed.) *Selections From Calcutta Gazette, 1824-1832* (Calcutta, 1959), p. 654.

মাল্লো, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা তখনো পর্যন্ত সাধারণভাবে তাঁদের বর্ণগত বৃত্তি আশ্রয় করে ছিলেন। কিন্তু কায়স্থদের অধিকাংশই বর্তমান শতকের সূচনায় ব্যবসায় ও চাকুরী গ্রহণ করেন, বৈদ্যেরা চাকুরী, অধ্যাপনা ও চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে মাত্র শতকরা তেরো জন তাঁদের শাস্ত্রসম্মত বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।[৩৩] বর্ণের সঙ্গে বৃত্তিকে মেলানো এর পরে আমাদের সমাজে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩৩. H. E. A. Cotton, *Ctlcutta Old And New* (Calcutta, 1907), pp. 248-249.

‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র লেখকসূচী

বর্ষ ১-৭৫ ॥ ১৩০১-৭৫ বঙ্গাব্দ

সংকলয়িতা শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র আনুপূর্বিক লেখকসূচী বর্ণানুক্রমে পরিবেশিত হইল। ইতঃপূর্বে ‘পরিষৎ-পরিচয়’ (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির তালিকা বিষয় ও বর্ষ অনুসারে সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু লেখকসূচী প্রণয়নের প্রয়াস এপর্যন্ত পরিষদের পক্ষ হইতে করা সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতে আধুনিক ধারায় সজ্জিত আনুপূর্বিক বিষয়সূচীও প্রকাশ করা হইবে।

লেখকসূচীতে প্রত্যেক লেখকের নামের পরে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের নাম, পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা পরপর বিন্যস্ত হইয়াছে। পত্রিকার ১ম বর্ষের তারিখ ১৩০১ বঙ্গাব্দ এবং ৭৫তম বর্ষের তারিখ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অক্ষয়কুমার কয়াল				
	দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল	৬৩	১	১৭-২৪
	কালুরায়মঙ্গল	৬৩	২	৮৩-৯১
	প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ (১)	৬৪	৩-৪	১১৯-১২২
	ঐ (২)	৬৫	৪	৩০৪-৩০৯
	কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্ব্বের রচয়িতা ?	৬৬	২	৯৪-৯৭
	কালিকামঙ্গলের একটি নূতন কাহিনী	৬৭	১	৭২-৭৬
অক্ষয়কুমার বড়াল	[সরলা দেবী চৌধুরাণী দ্রষ্টব্য]			
অক্ষয়চন্দ্র সরকার				
	বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা	১৩	১	২৩-২৪
অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি				
	ঈশাননাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ	৩	৪	২৪৯-২৫৪
	নরোত্তম ঠাকুর	৪	১	৩১-৩৮
	লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র	৪	৩	১৭৬-১৮৩
	স্ত্রীকবি মাধবী	৫	৩	১৫৯-১৬৪
	রঘুনাথ শিরোমণি	১১	১	১-১২
অজয়কুমার চক্রবর্তী				
	গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	৬১	২	১০০-১০১

লেখক / প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
কালিকারঞ্জন কানুনগো			
বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়	৪৫	৪	২০৫-২১৪
শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান	৪৬	২	১০৯-১১৬
আমীর খুস্‌রু-কৃত 'দেবলারাণী-খিজির খাঁ' কাব্য	৪৬	৪	২৫১-২৬৮
কবি আলাওল-কৃত 'পদ্মাবতী' পুথি এবং জায়সী-কৃত মূল 'পদ্মাবত' কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা	৫০	১	১৭-৩২
কালিদাস দত্ত			
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান-ভুক্তি	৪১	১	১৯-২৩
পঞ্চানন্দের গান	৬৪	৩-৪	৮১-৯১
কালিদাস নাথ			
বৈষ্ণব-কবি জগদানন্দ	৫	৪	২৭০-২৮০
বাঙ্গলার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য	৮	৪	২৫৪-২৬২
কালিদাস মল্লিক			
পরিভাষা : রসায়ন-শাস্ত্র-বিষয়ক	৩	৩	১৭৪-১৭৯
কালীকান্ত স্মৃতি-বেদান্ততীর্থ			
অসমীয়া সাহিত্যের একখানি পুস্তক দেবজিত	২০	৩	২৩১-২৩৬
কালীপদ পাঠক [রাজ্যেশ্বর মিত্র দ্রষ্টব্য]			
কালীবর বেদান্তবাগীশ			
শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৭	অতিরিক্ত-২	১-২৫
কিরণকুমার সেনগুপ্ত			
কয়লা-ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার	৩৩	২	১২৭-১৩০
কুঞ্জকিশোর চৌধুরী			
দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ	২০	৪	২৪১-২৬৬
কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী			
শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ	৩৭	৩	১৬২-১৭৪
কুঞ্জলাল রায়			
ছড়া : বর্দ্ধমান—দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত	৩	১	৫৬-৬১
কৃষ্ণতারণ রায়চৌধুরী			
যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ	৩০	১	১-৫
কৃষ্ণনাথ সেন			
ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম্যভাষার অভিধান	১৯	৪ ?	৩৭-৫৬

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী [পূর্বানুবৃত্তি]				
	তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র	৪৬	৪	২৯৬-৩০০
	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি	৪৮	৩	১৩৭-১৫২
	চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচস্পতি	৪৯	২	৬৪-৬৫
	বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ	৪৯	৪	১৩৮-১৪৩
	নদীয়ার ভাষা	৫১	১-২	৪০-৪২
	ত্রিনাথ	৫২	১-২	৩৬-৩৮
	বাংলার পুরাণকাহিনী	৫৬	১-২	৪৫-৪৮
	বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	৫৭	১-২	১-৮
	পুথির শেষ কথা	৫৭	৩-৪	৫২-৫৮
	গ্রন্থরসিক রাজনারায়ণ	৫৮	১-২	১৭-১৮
	একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র	৫৮	১-২	১৯-২১
	সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র	৫৮	৩-৪	৩৯-৪১
	তান্ত্রিক কার্যে বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগ	৫৯	১-২	৩৫-৩৭
	পঞ্চম বেদসার নির্ণয়	৫৯	৩-৪	৬৮-৭২
	ব্রজেন্দ্রনাথ ও বসন্তরঞ্জন	৬০	১	২৩-২৫
	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি	৬৫	২	১৪৯-১৫৭
	কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি—আদিকাণ্ড	৬৫	৪	২৫৩-২৬২
	বাংলার লৌকিক দেবদেবী	৬৭	১	৮-২৫
	বাংলায় জীমূতবাহনের কাহিনী	৬৭	৩-৪	১৬৭-১৮৭
চুনীলাল রায়				
	মানভূম-বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা	২৮		২৫-২৭
চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি				
	ত্রিনাথের উপাখ্যান	১৮		২৫-২৭
জগদিন্দু রায়				
	আলোকের পরাবর্তন ও তির্য্যগ্‌বর্তন আলোচনায় ব্যাবর্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ	২১	২	১১১-১১৫
জগদিন্দ্র ভৌমিক				
	জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও জীবন-কথা ॥ গ্রন্থসূচী	৬৫	৩	২৩৫-২৪০
জগন্নাথ দেব				
	শ্রীহট্ট ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ	১৯	৩?	১৭১-২০৬
	মহাকবি সঞ্জয়	২৭	২	৪১-৫২

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য				
	নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি	২২	৪	২৮৭-২৯১
	বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	২৩	৪	২৪১-২৫০
	সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা	২৪	২	৯৩-১০০
	বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	২৫	২	৬৯-৭৬
	প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল	২৬	৩	১৪৭-১৮৬
	"বৌদ্ধগান ও দোহা" প্রবন্ধের আলোচনা	২৭	৪	১৫৩-১৫৬
	মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম	৪৫	২	১১৪
	বৈদিক অসুর ও দেবতা	৬১	১	১৪-১৬
	পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	৬১	১	৪৫-৫২
	বৈদিক দেবতা ও অসুর	৬১	২	৭৫-৭৯
	পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	৬১	২	১০৪-১১১
	বৈদিক অসুর ও দেবতা	৬১	৩	১৩৬-১৪৪
	পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	৬১	৩	১৫৩-১৬০
	বৈদিক অসুর ও দেবতা	৬১	৪	২২৪-২২৮
	পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	৬১	৪	২২৯-২৩৬
	ঐ	৬২	১	৫৬-৬৩
	ঐ	৬২	২	১৪৪-১৫১
	ঐ	৬২	৩	২১৬-২৩২
	ঐ	৬২	৪	৩০৫-৩২০
	ঐ	৬৩	১	৪৪-৬০
	ঐ	৬৩	২	১১৫-১৩০
	ঐ	৬৩	৩	১৬৩-১৭৮
	ঐ	৬৩	৪	২০৩-২২০
	ঐ	৬৪	১-২	৫৩-৬৬
	ঐ	৬৪	৩-৪	১২৩-১৩৬
তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়				
	দেলপূজার ছড়া	৪৭	৪	২৬৪-২৭২
ত্রিদিবনাথ রায়				
	কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলের রচনার কাল	৪২	১	৫৩-৫৪
	চৌরপঞ্চাশিকা	৫৩	৩-৪	৬১-৬৯
	বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য	৬০	২	৬১-৭৬

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য				
	হরিদাস তর্কাচার্য্য	৪৭	১	৪৭-৫৬
	প্রগল্‌ভাচার্য্য	৪৭	২	৬৯-৭৭
	পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর	৪৭	৩	১৪৯-১৫৮
	মহাদেব আচার্য্যসিংহ	৪৭	৪	২৪৩-২৫৩
	জগদীশ পঞ্চানন	৪৮	১	৩৪-৪৪
	গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ	৪৮	২	৬৬-৭৭
	কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়	৪৮	৩	১০৫-১২০
	ভারতচন্দ্র ও ভুরসুটরাজবংশ	৪৮	৪	১৮৯-২০০
	জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	৪৯	১	১-১৪
	কৃত্তিবাসের বংশলতা	৪৯	১	৪০-৫১
	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্টোপাধ্যায়রবংশ	৪৯	২	৪৩-৫৪
	বৈদ্যকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর	৪৯	৩	৯৩-১০৫
	রঘুনাথ শিরোমণি—১	৪৯	৪	১১৭-১২৬
	রঘুনাথ শিরোমণি—২	৫০	১	৬-১৬
	শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার (১)	৫০	২	৩৯-৪৮
	প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল	৫০	৩	৬২-৬৪
	শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার (২)	৫০	৪	৯৭-১০৪
	নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ	৫১	১-২	২৪-৩১
	রামচন্দ্র সার্ব্বভৌম	৫১	৩-৪	৬২-৭২
	রামপ্রসাদ	৫২	১-২	১-১৬
	বালবলভীভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব	৫২	৩-৪	৯৬-১০৮
	বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা (প্রাক্‌শিরোমণিযুগ)	৫৩	১-২	১-১৮
	নবাবিষ্কৃত রাত-শাসন	৫৩	৩-৪	৪১-৫৪
	রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ	৫৪	১-২	১-৮
	প্রত্যুত্তর (সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের তাম্রশাসন)	৫৪	১-২	১৭-১৮
	চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব	৫৪	১-২	২১-৩০
	ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ	৫৫	৩-৪	৪৯-৬৬
	কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়চন্দ	৫৬	১-২	১৬-৩২
	বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য	৫৬	৩-৪	৬৬-৮১
	আদিশূরের প্রাচীন উল্লেখ [আলোচনা]	৫৭	৩-৪	৬৯-৭০
	মথুরানাথ তর্কবাগীশ	৫৭	৩-৪	৭১-৮৫

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
দুর্গামোহন ভট্টাচার্য				
	অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখা	৬৬		৫১-৬১
দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য				
	ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	২১		৯৭-১০২
দে, অ.				
	বিদ্যাপতি : শব্দের তালিকা	২	৪	৪১৩-৪৪১
	ঐ	৩	১	১৮-৪৮
	ঐ	৩	২	১০৩-১০৯
দেবজ্যোতি দাশ				
	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী	৭১	১-৪	...
	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও বাংলা সাহিত্যজগৎ	৭৩	১-৪	২৩-৩৩
	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪	২	৩৩-৮৮
	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র লেখকসূচী : ১-৭৫ বর্ষ	৭৫	২-৪	৯১-....
দেবনারায়ণ ঘোষ				
	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচীন কবি	১৫	৪	২৪৪-২৪৮
	ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ	১৯	৪?	২৫-৩৬
দেবপ্রসাদ ঘোষ				
	"পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৬		৬০-৬১
দেবীপদ ভট্টাচার্য				
	মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ	৬৬	৩-৪	২৫৫-২৭৩
	শ্রুতকীর্তি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে	৬৭	১	২৬-৭১
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় [প্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য]				
দেবেন্দ্রনাথ বসু				
	নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ	১৬	৪	২০১-২০২
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক				
	আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস	২১	২	১০৩-১০৯
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়				
	জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?	১	১	৩৬-৪৭
দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়				
	মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি	১৯	৩ ?	১৪৭-১৫৪
দ্বারকানাথ চৌধুরী				
	সদাশিব	১৯	২	৭৫-৭৮
	শ্রীহট্টের পঁই	২০	১	৭৭-৮০

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (পূর্বানুবৃত্তি)				
	গোপীনাথপুরের শিলালিপি	৬	১	৩৫-৪৬
	বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬	১	৪৭-৮০
	জৈন পুরা-কাহিনী	৭	২	৭০-৭৮
	'জগন্নাথ-বিষয় ও কবি মুকুন্দ' সম্বন্ধে মতামত	৭	৪	১৩০-২৩৩
	সম্পাদকীয় মন্তব্য ('গোতমের প্রতিভা')	১১	২	১০০-১০১
	ঐতিহাসিক সমস্যা	১১	২	১১৫-১২৫
	রামরাস (৺কবি কৃত্তিবাস)	১১	২	১২৫-১২৬
	বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ	১৪	১	১-২৪
	রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর-লিপি	১৬	৩	১২৯-১৪০
	"শূন্যপুরাণ" সম্বন্ধে মন্তব্য	১৬	৪	২২১-২২৪
	রাণক কুলস্তম্ভের তাম্রশাসন	১৮	১	৫৯-৬৩
	বল্লালসেনের তাম্রশাসনের পাঠশোধন	১৮	১	১১৬
	সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য	১৮	৩	১৯৫-১৯৬
	রাজা দত্তখাস কে ?	১৮	৩	১৯৭-২০০
	কাশীরামের জন্মস্থান	১৯	২	১২৫-১২৮
	বর্দ্ধমানের কথা	২২	১	১-২
	বর্দ্ধমানের পুরাকথা	২২	১	৩-২১
	স্থান-পরিচয়	২২	১	২২-৪২
	শ্রীবিক্রমপুর (প্রতিবাদের উত্তর)	২২	১	৭৩-৭৬
	লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি	২২	২	৯৫-১০৬
	গাজী সাহেবের গান	৩৫	১	৩১-৫৬
	বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়	৩৭	৪	১৯৩-২১৫
	উত্তররাঢ়ে সেন-রাজধানী	৪১	২	৫৫-৬২
ননীগোপাল দাশশর্মা				
	ব্যাকরণের পুরুষ	৫৯	৩-৪	৭৩-৭৭
	বচনসমস্যা, না বিভক্তি-বিভ্রাট	৬০	১	৩০-৩২
	লিঙ্গ	৬০	৪	২০২-২০৫
	অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয়	৬১	২	১০২-১০৩
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়				
	ধর্ম্মপূজাবিধি	২১	৩	১৭৯-১৮৪

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (পূর্বানুবৃত্তি)				
	আসাম-পর্য্যটন	১৭	১	৪১-৫২
	বলবর্ম্মার তাম্রশাসন	১৭	২	১১৩-১২৮
	আসাম-ভ্রমণ : দ্বিতীয় প্রবন্ধ	১৮	৩	১৮১-১৮৯
	আসাম-ভ্রমণের পরিশিষ্ট	১৮	৩	১৯০-১৯১
	দীপিকা-ছন্দ (অসমীয়া-গ্রন্থ-বিবরণ)	১৯	১	৪৫-৫৮
	আসাম-ভ্রমণ : তৃতীয় প্রবন্ধ	২০	১	৩৭-৪৩
	আসাম-ভ্রমণ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট	২০	১	৪৩-৪৬
	প্রাচীন কামরূপের রাজমালা	২০	৩	১৮৯-১৯৪
	আসামের পত্র-পত্রিকা	২৪	২	৬৯-৯০
	সমতটের পূর্ব্বে	২৬	১	১-১৮
	হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি	২৭	২	২৫-৩৭
	শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন (আলোচনা)	২৮	৪	১৭৫-১৮৩
	আসামের নানা কথা	৩০	৩	৮৭-৯১
পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়				
	ঠাকুর-মা'র ইতিহাস	২১	৩	১৯৩-১৯৮
পরমেশপ্রসন্ন রায়				
	ঢাকার গ্রাম্যশব্দসংগ্রহ	১৬	৪	২৪১-২৪৮?
পাঁচকড়ি ঘোষ				
	জগৎরাম রায়ের রামায়ণ	২	৩	৩০১-৩১১
পাঁচুগোপাল রায়				
	রামকৃষ্ণের শিবায়ন	৪৮		২৫-৩৩
পারিভাষিক সমিতি				
	ভৌগোলিক পরিভাষা	৩	২	১৫৩-১৬৮
	উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা	১০	১	৫৫-৮২
পুলিনবিহারী সেন				
	আচার্য্য যদুনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	৬৫	১	৭৩-৭৬
	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও জগদীশচন্দ্র	৬৫	৩	২৪১-২৪৯
পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়				
	রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ : সন্ধ্যাসংগীত	৬৬	৩-৪	৩৫৯-৪৬৬
পূরণচাঁদ নাহার				
	মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি	২৪	৩	১৯৭-১৯৯
	মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি	৩১	১	৩৯-৪২
	জৈন-মূর্ত্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩৫	৪	১৮২-১৯৩

লেখক / প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী			
প্রতিবাদ ['সমতটের পূর্ব্বে']	২৮	১	১৫-১৮
পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর			
রঘুনাথ শিরোমণি বা কানভট্ট শিরোমণি	১১	১	১৩-২৪
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়			
স্মৃতিসভা	৬৫	১	৮১-৮৩
অক্ষয়কুমার বড়াল শতবার্ষিকী : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভা	৬৬		৭৮
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মণি সেন			
পরিষদে রক্ষিত নবগ্রহ-মূর্ত্তি	৬৪	৩-৪	১০০-১০২
পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ			
কামতাবিহারী ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	১৮	৪	২১৯-২২৬
একখানি খোদিত তাম্রফলক	২১	৩	১৯৯-২০২
প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়			
বঙ্গভাষায় বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ	১৮	৪	২৫১-২৫৯
বাঙ্গালা শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা	২১	৩	১৬৭-১৭৮
প্রণবেশ সিংহ রায়			
অনুবাদাত্মক সমাস	৫২	১-২	২৫-৩২
প্রফুল্লকুমার দাস			
সংগীতচিন্তায় প্রাচীন ভারত ও রবীন্দ্রনাথ	৬৬	৩-৪	২৮৭-২৯৩
প্রফুল্লকুমার সরকার			
সুবর্ণ-বিহারের স্তূপ	২১	৩	২০৫-২০৮
প্রফুল্লকুমার সরকার ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়			
ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক	১৭		৩৭-৪০
প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়			
বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব	৪	১	৪৭-৬০
কৃত্তিবাস পণ্ডিত	৪	২	১১৭-১৪৯
বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব	৪	৩	১৫৯-১৭৫
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত গুহ কবিভূষণ			
চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ	৮	৩	১৫০-১৬২
আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	১০	২	৯১-১০২
প্রবোধকুমার দাস			
"গৌড়ীয় সমাজ" (প্রতিবাদ)	৬০	২	৮৯-৯১

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (পূর্বানুবৃত্তি)				
	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	১৮	২	১২৩-১৩২
	"চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	২৫	৩	১৪১-১৪৬
	দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ	২৬	২	৯৩-১০৪
	ময়নামতীর পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ	২৮	২	৪৯-৬১
	পরিষৎ-পুঁথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	২৯	৩	১-১৬
	ঐ	২৯	৪	১৭-৩২
	ঐ	৩০	৪	৩৩-৯৬
	ঐ	৩১	১	৯৭-১২৮
	ঐ	৩১	২	১২৯-১৫৯
	ঐ	৩২	১	১-৪০
	ঐ	৩২	২	৪১-৬৪
	ঐ	৩২	৩	৬৫-৮০
	তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব	৩৫	৪	১৭১-১৮১
	কৃত্তিবাসের জন্ম-শক (আলোচনা)	৪০	৩	১১১-১১২
	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল	৪৩	৪	১৩৯-১৪১
	চণ্ডীদাস (আলোচনা)	৪৪	১	৩৩-৩৮
	আলোচনা : কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল	৪৫	৪	২৮১-২৮৪
বসন্তরঞ্জন রায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়				
	কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল-নির্ণয়	২২	৩	১৬১-১৬৬
বিজয়চন্দ্র মজুমদার				
	দেশী শব্দ	১১	১	৩৯-৪৪
	পালি ও বাঙ্গালা	১৫	১	১-৮
	ব্যাকরণের সন্ধি	১৮	১	৯-১৬
	ভারতবর্ষের বর্ণমালা	১৯	১	৩৯-৪৪
	বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান	২০	১	১১-১৬
	'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য	২৪	৩	১৯১
বিধুভূষণ ঘোষ				
	গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ	৬০	৪	১৬৩-১৭৪
বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী				
	ঋকার-তত্ত্ব	২৪	৩	১৮১-১৯০
	ঋ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর	২৪	৩	১৯৩-১৯৫
	অকার-তত্ত্ব	২৫	১	১৩-৬২
	বিজ্ঞানবাদ	৪৬	৩	১৬১-১৭০

লেখক	প্রবন্ধ	বষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (১)				
	বুদ্ধের দেশনা	৬৫	১	৯-১৬
	রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ্	৬৬	৩-৪	১৩১-১৬০
	পাতঞ্জল মহাভাষ্য	৬৭	২	৯০-১০১
	ঐ	৬৭	৩-৪	১৮৪-২০১
	ঐ	৭০	১-৪	৫২-৬৮
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (২)				
	হিন্দী ভাষার কথা	৬৬	১	১৯-৩১
	ঐ	৬৬	২	৭৯-৯৩
	রবীন্দ্র-তন্ত্র	৬৬	৩-৪	২৭৪-২৮৬
বিহারীলাল চক্রবর্তী [ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী দ্রষ্টব্য]				
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস				
	রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদ	৬৬	৩-৪	৩২৭-৩৫৮খ
	রবীন্দ্রশব্দের গঠনবৈচিত্র্য	৬৯	১-৪	২১-৪৫
	রূপকাত্মক-শব্দ-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস	৭০	১-৪	৬৯-৮৩
বীরেশ্বর পাঁড়ে				
	আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	২	১	৫১-৭৪
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য				
	বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত	৬৪	৩-৪	৯২-৯৯
বেণীমাধব বড়ুয়া				
	"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা	৩১	২	৮৫-৮৬
	ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব	৪৫	৪	২০১-২০৪
	গুপ্তযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিস্থিতি	৪৬	২	১০৪-১০৮
	শিবচরণের গীতপদ	৪৭	২	৮৭-১০২
	বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান	৫২	৩-৪	৪৯-৮২
ব্যোমকেশ মুস্তফী				
	কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল	৩	৩	২২৬-২৪৮
	কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল	৩	৪	২৯৭-৩০২
	বিবিধ প্রসঙ্গ	৪	৩	২৩৫-২৪০
	শীতলা-মঙ্গল	৫	১	২৭-৭০
	পাঁচালিকার ঠাকুরদাস	৫	৩	২০৫-২২১
	রাজকবি জয়নারায়ণ	৭	১	১-২৫

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ব্যোমকেশ মুস্তফী (পূর্বানুবৃত্তি)				
	সত্যনারায়ণ-কথা	৮	১	৫৫-৭২
	সত্যদেব-সংহিতা	৮	২	১৩১-১৩৬
	বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত	৮	৪	২২৯-২৪০
	বাঙ্গালা-নামরহস্য	১৩	২	৯৭-১০৭
	কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ	১৩	৪	১৯৩-২৩৬
	বাঙ্গালা নাম রহস্য	১৫	১	৪১-৪৭
	বাঙলার উপসর্গ	১৫	৩	১৬৫-১৭০
	বাঙ্‌লা-বিশেষণ-রহস্য	১৭	৩	১৭৫-২০৪
	বাণীকণ্ঠের "মোহমোচন" নামক প্রাচীন গ্রন্থ	২০	৩	২১১-২২০
	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা	২১	১	৪৯-৬১
ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়				
	কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপণিষৎ	৯	২	৬৫-৭৬
	বৈদিক তত্ত্ব	১২	৪	১২৯-১৩৯
ব্রজসুন্দর সান্যাল				
	সত্যনারায়ণের পাঁচালী	৮	৩	১৯৩-২০০
	শরৎ-কালী : (গ্রাম্য কবিতা)	১০	২	১০৩-১০৭
	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	১০	২	১২৬-১২৮
	মাণিক গাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল	১২	১	১-১৩
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়				
	চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি	১৮	৩	১৯৩-১৯৫
	"চিরঞ্জীব শর্ম্মা" (আলোচনা)	৩৭	৪	২৪০-২৪২
	"রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী" (ঐ)	৩৮	২	১০২-১৩১ ও ১৩৩
	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮১৬-১৮২২	৩৮	৩	১৭৭-১৯৮
	জোড়াসাঁকো নাট্যশালা	৩৮	৩	২০৩-২১৩
	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮২৩-১৮৩৫ সেপ্টেম্বর	৩৮	৪	২৬৭-২৯৪
	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	৩৯	১	৭-৮
	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস	৩৯	১	৯-৭০
	ঐ	৩৯	২	১০৫-১২৯
	ঐ	৩৯	৩	১৫৩-১৭৫

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্বানুবৃত্তি)				
	হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত	৪৬	৩	১৯২-১৯৫
	সেকালের সংস্কৃত কলেজ	৪৬	৪	২৪৩-২৫০
	ঐ	৪৬	৪	২৯৩
	ঐ	৪৭	১	৫-১৩
	ঐ	৪৭	২	৭৮-৮৬
	'বাংলা সাময়িক-পত্র'	৪৭	৩	১৪২-১৪৮
	সেকালের সংস্কৃত কলেজ	৪৭	৩	১৫৯-১৬৫
	ঐ	৪৭	৪	২৩৭-২৪২
	ঐ	৪৮	১	১৯-২৪
	ঐ	৪৮	৩	১২১-১২৫
	ঐ	৪৮	৪	১৫৩-১৬৮
	মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম জীবন	৪৯	৩	৮১-৯০
	মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ	৫০	১	১-৫
	ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবন	৫০	২	৩৩-৩৮
	রাজকৃষ্ণ রায়	৫১	১-২	৬-২৩
	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—রচনাপঞ্জী	৫১	৩-৪	৭৩-৭৯
	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থপঞ্জী	৫২	১-২	১৭-২২
	রচনাপঞ্জী : অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫২	৩-৪	৮৩-৮৮
	রচনাপঞ্জী : (ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়			
	(খ) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৩	১-২	১৯-২১
	রচনাপঞ্জী : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	৫৩	৩-৪	৫৫-৬০
	রচনাপঞ্জী : রমেশচন্দ্র দত্ত	৫৪	১-২	৯-১০
	রচনাপঞ্জী : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে			
	অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা	৫৪	১-২	১০-১২
	রচনাপঞ্জী : অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে			
	অপ্রকাশিত রচনা	৫৪	১-২	১২-১৪
	বাংলা সাময়িক-পত্র	৫৪	৩-৪	৫৭-৭৫
	ঐ	৫৫	১-২	২১-৪৮
	ঐ	৫৫	৩-৪	৬৭-৮৭
	ঐ	৫৬	১-২	৩৩-৪৪
	ঐ	৫৬	৩-৪	৪৯-৫৯

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (পূর্বানুবৃত্তি)				
	বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থপরিচয়	৬২	১	১৪-২৬
	ঐ	৬২	২	৯০-১০০
	ঐ	৬২	৩	১৭৪-১৮১
যতীন্দ্রমোহন রায়				
	শ্রীবিক্রমপুর	২২		৬৩-৭১
যদুনাথ সরকার				
	বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে	৪২	১	১-৬
	সভাপতির অভিভাষণ	৪২	১	৫৯-৬৩
	মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী	৪২	২	৭৯?-৮৩?
	মারাঠা জাতির অভ্যুদয়	৪৩	১	১-৭
	শিবাজী	৪৩	১	৮-১৫
	শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা	৪৩	১	১৬-২২
	মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ	৪৫	১	৬০-৬৪
	মুঘল ভারতের ইতিহাস	৪৫	২	৬৫-৭২
	মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ	৪৬	২	৭৩-৭৮
	'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস	৪৬	৪	২৪০-২৪২
	রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা	৪৭	১	১-৪
	মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা	৪৭	৪	২৩৩-২৩৬
	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৯	২	—
	দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি	৫০	৩	৫৭-৬১
	নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?	৫১	১-২	১-৫
	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'	৫১	৩-৪	৮৬-৯৫
	সভাপতির অভিভাষণ	৫২	১-২	৩৯-৪২
	মানপত্রের উত্তরে অভিভাষণ [আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা]	৫৫	৩-৪	৯০-৯৩
	বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির	৬৫	১	৭৭-৮০
যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত				
	ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ	২৩	১	১-১৪
	ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য	২৩	২	১২৩-১৩৮
	দশম স্বতঃসিদ্ধ	২৩	৪	২৬৩-২৮১
	ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য	২৪	১	১-২০

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ				
	সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়	৪০	৪	১৫৯-১৬৬
	রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি বাসস্থান	৪১	২	২৫-৩৭
	সেনরাজগণের রাজ্যকাল	৪২	২	৬৫-৬৯
	ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান	৪২	৩	১৫৩-১৫৭
	পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গালা দেশ	৪৩	২	৪৯-৫৯
যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ				
	ভারতীয় সূদবিদ্যা	৩১	৩	৯২-৯৪
যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক				
	বাঘাইর বয়াত	১৯	৩?	১৬৭-১৭০
	ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ	২০	৩	২৩৭-২৩৯
যোগেশচন্দ্র বাগল				
	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭	১	১৪-৩৫
	শিক্ষা-বিস্তারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০	৩	৬৫-৮৪
	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০	৪	১০৫-১০৮
	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	৫১	১-২	৩১-৩৭
	অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	৫১	৩-৪	৮৩-৮৫
	গৌড়ীয় সমাজ	৬০	১	১৬-২২
	"গৌড়ীয় সমাজ" (উত্তর)	৬০	২	৯১-৯৪
	হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৬২	৪	২৭৫-২৮৯
	বেথুন সোসাইটি	৬৩	১	২৫-৩৫
	ঐ	৬৩	২	৯২-১৫০
	ঐ	৬৩	৩	১৫৫-১৬২
	ঐ	৬৩	৪	১৯৫-২০২
	ঐ	৬৪	১-২	১৪-২৯
	ঐ	৬৫	১	১৭-২৫
	ঐ	৬৫	২	১৫৮-১৬৫
	ঐ	৬৫	৩	১৯২-১৯৯
	ঐ	৬৫	৪	২৬৮-২৮০
	সরলা দেবী চৌধুরাণীর রচনাপঞ্জী	৬৬	২	১২০-১২৭

[[illegible]
ও সনৎকুমার গুপ্ত দ্রষ্টব্য]

লেখক	প্রবন্ধ	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
রমাপ্রসাদ চৌধুরী				
	বাংলা ভাষায় পালি শব্দ ও ইডিয়ম	৫৯	৩-৪	৫৪-৬৭
রমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ				
	তান্ত্রিক ধর্মের ইতিবৃত্ত	৬১	২	৯২-৯৭
	ঐ	৬২	২	১০১-১০৮
	ঐ	৬২	৩	১৯১-১৯৯
রমেশচন্দ্র দত্ত				
	বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	১	১	১-৬
	মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	১	৩	১৫৪-১৬৮
রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত				
	ভারতীয় জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার	৬২	৩	১৬৭-১৭৩
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়				
	গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ	৪৬	১	৩৭-৪০
	ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল	৪৮	২	৮৭-১০৪
	ঐ	৪৮	৩	১২৬-১৩৬
	ঐ	৪৯	২	৬৬-৮০
রমেশচন্দ্র বসু				
	দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়	৫	৪	২৯২-২৯৩
	পয়ার-ছন্দের উৎপত্তি	১১	৩	১৪৮-১৬০
রমেশচন্দ্র মজুমদার				
	নারায়ণপালের লিপি	২৮	৪	১৬৯-১৭৩
	সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ	৪৬	৪	২৩৩-২৩৯
	দেশাবলিবিবৃতি	৫৫	১-২	১-২০
	রত্নসেনের বংশাবলী	৫৬	১-২	১-১৫
রমেশ বসু				
	বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদের কথা	৩৩	১	৩৭-৪৪
	বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা	৩৪	১	৫৭-৭৪
	চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন	৩৪	৪	২৩৩-২৪৮
	প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ	৩৫	২	৭৭-১০১
	ঐ	৩৫	৪	১৯৯-২২২
	লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন	৩৭	৪	২১৬-২২৫

পরিষদে অনুষ্ঠিত সভাসমিতির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নানা সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; এ-সকল বিবরণে যে-সকল পঠিত কবিতা, ভাষণ বা পত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল সেগুলির নির্বাচিত লেখকসূচী নিম্নে পৃথকভাবে পরিবেশিত হইল :

লেখক	পঠিত রচনা	বর্ষ	সংখ্যা	
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়				
	কবিতা [করুণানিধান-সংবর্ধনা]	৫৬	৩-৪	৮৪-৮৫
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য				
	প্রশস্তি [আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা]	৫৫	৩-৪	৮৮
নির্মলকুমার বসু				
	ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি [লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরণী]	৬২		৬৭-৬৯
প্রভাকর মাচোয়ে				
	মহারাষ্ট্র-সাহিত্য [লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরণী]	৬২		৭০ ৭১
যদুনাথ সরকার				
	অভিভাষণ [আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা]	৫৫	৩-৪	৯০-৯৩
যোগেশচন্দ্র রায়				
	বাণী [আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা]	৫৫	৩-৪	৮৮-৮৯
	পত্র [করুণানিধান-সংবর্ধনা]	৫৬	৩-৪	৮৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়				
	লিখিত ভাষণ [হেমলতা দেবীর একনবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অর্ঘ্যদান উৎসব]	৬৭	ক্রোড়পত্র	৪-৫
হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী				
	ভাষণ [আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা]	৫৫	৩-৪	৯৩
হেমলতা দেবী				
	ভাষণ [একনবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে]	৬৭	ক্রোড়পত্র	১-৩
	শেষ পুরস্কার [ঐ]	৬৭	ঐ	৪

পরিষদের সভায় পঠিত প্রবন্ধাদির বিষয়ে আলোচনার বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; এ-সকল বিবরণে যাঁহাদের বক্তব্যের সারাংশ পরিবেশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাঁহাদের একটি নির্বাচিত সূচী প্রদত্ত হইল :

আলোচনাকারী	আলোচনা	বর্ষ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অবিনাশচন্দ্র মজুমদার				
	"খনিবিদ্যার পরিভাষা" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৮৫

আলোচনাকারী	আলোচনা	বর্ষ	সংখ্যা	
অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ				
	"পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৭৪
	পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য	৩০	১	৩৯
	"প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি" : আলোচনা	৩৩	৩	১৯৪
আবদুল গফুর সিদ্দিকী				
	"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৬৪
চুণীলাল বসু				
	"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৬১, ৬৪
	"নালিতা" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৬৮ ৬৯
	"পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৭৪
	"খনিবিদ্যার পরিভাষা" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৮৬
	আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্বন্ধে মন্তব্য	২৯	২	৯৩
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ				
	"পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৭৩
	"খনিবিদ্যার পরিভাষা" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৮৬
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ				
	"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৬১-৬২
প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য				
	"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৬২
বনওয়ারিলাল চৌধুরী				
	"প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি" : আলোচনা	৩৩	৩	১৯২
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ				
	"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৬৪
বিমানবিহারী মজুমদার				
	পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য	৩০	১	৩৯
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত				
	"প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি" : আলোচনা	৩৩	৩	১৯৩
মণীন্দ্রমোহন বসু				
	"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা	২৮	২	৬২-৬৩
মন্মথমোহন বসু				
	পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য	৩০		৪০

সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	স্তম্ভের পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	১	৫	দ্বারকনাথ	দ্বারকানাথ
৯৪	৪	১০	৪	৩৭
১৩৬	২	৬	শ্রীধর পাঠক	শ্রীধর কথক

অনঙ্গমোহন সাহার লিখিত প্রবন্ধগুলির তালিকায় 'গণিতের পরিভাষা' [বর্ষ ৪২ সং ৩ পৃ. ১৫৮-১৬২] প্রবন্ধটি ভ্রমক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; প্রবন্ধটি তৎপরিবর্তে অনঙ্গমোহন সাহা, সুকুমার-রঞ্জন দাশ ও দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের তালিকাভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্

পঞ্চসপ্ততিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চসপ্ততিতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৫তম বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে পঁচাত্তর বৎসর ধরিয়া বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় একনিষ্ঠভাবে আপন কর্তব্য পালন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আজ পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই বার্ষিক অধিবেশনে ৭৫তম বার্ষিক কার্যবিবরণ উপস্থাপিত করিবার পূর্বে বিগত বৎসরে যে সকল প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবী পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ ও ভারততত্ত্ববিশারদ্ ডঃ বিমলাচরণ লাহা পরিষদের অন্যতম আজীবন সদস্য ছিলেন এবং ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার লিখিত মনোজ্ঞ প্রবন্ধগুলি গবেষকমাত্রেরই আদরণীয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ একজন বিজ্ঞ বন্ধু হারাইয়াছেন।

বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ ও সাহিত্যিক ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত ২৮ আষাঢ় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (১৩ জুলাই ১৯৬৯) রবিবার ঢাকায় তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের এক বিশেষ হিতৈষীর তিরোধান ঘটিল। পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পরিষদ্-হিতৈষী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পরলোকগমনও আমরা দুঃখিতচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

জয়ন্তী উৎসব ॥

বিগত ৯ শ্রাবণ ১৩৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সভায় গৃহীত ৭৫তম বর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসবের কার্যসূচী অনুযায়ী আলোচ্যবর্ষে ১৪ চৈত্র ১৩৭৫ তারিখ হইতে এক পক্ষকালব্যাপী দুইটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রবীণ সাহিত্যিক-কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব। তন্মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং টেরাকোটা ভাস্কর্য ও মূর্তির

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়। প্রদর্শনী দুইটি শিক্ষিতসমাজে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় এবং বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীর সমাগমে প্রদর্শনী দুইটি সার্থকতা লাভ করে।

উপরি-উক্ত কার্যসূচী অনুযায়ী আলোচ্যবর্ষে ১৫ চৈত্র ১৩৭৫ হইতে ১৭ চৈত্র ১৩৭৫ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় যথাক্রমে 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানশিক্ষা', 'বাংলা সাহিত্য: প্রথমপর্ব' এবং 'বাংলা সাহিত্য: দ্বিতীয় পর্ব'-বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন যথাক্রমে শ্রীপরিমলবিকাশ সেন, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ও শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। এই সকল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন —শ্রীসুহৃদচন্দ্র সিংহ, শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র এবং শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন। এই সভাগুলিতে একদিকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপকগণ এবং অন্যদিকে জনসাধারণ ও ছাত্রগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া প্রতিদিনের আলোচনাকে বিশেষ তাৎপর্য ও সাফল্যমণ্ডিত করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচীটি পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লেখিত হইল। প্রতিদিনের সভাতেই অভূতপূর্ব জনসমাগমে সভাকক্ষে তিলধারণের স্থান ছিল না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজও যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক এই জনসমাগমে ইহাই নূতন করিয়া প্রমাণিত হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আমরা এপর্যন্ত মোট ৬৮ জন জয়ন্তী সদস্য পাইয়াছি।

জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আনন্দের সহিত জানাই যে, এই গ্রন্থের আংশিক ব্যয়ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

জয়ন্তী-উৎসবের অপর কার্যসূচী অনুযায়ী ভারতকোষের জন্য নূতন গ্রাহক গ্রহণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যে ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৬ পর্যন্ত ১৪৬ জন গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইয়াছেন।

স্মৃতিসভা ॥

বিগত ৯ ফাল্গুন ১৩৭৫ তারিখে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ৺রামপ্রাণ গুপ্ত জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালিত হয় এবং এই উপলক্ষে উক্ত তারিখে ৺রামপ্রাণ গুপ্ত -স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী। শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ ৺রামপ্রাণ গুপ্ত -স্মৃতিপুরস্কার-বক্তৃতা হিসাবে 'বঙ্গদেশে মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব' বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। এই উপলক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীআনন্দপ্রাণ গুপ্ত। শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয়ের সভাপতির অভিভাষণান্তে শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই বৎসর ৺রামপ্রাণ গুপ্ত -স্মৃতিপুরস্কার শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে প্রদান করা হয়।

শোকসভা ॥

ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের অকস্মাৎ পরলোকগমনে বিগত ২০ বৈশাখ ১৩৭৬ তারিখে ২ ঘটিকায় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে পরিষদ্-মন্দিরে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবটি পরলোকগত রাষ্ট্রপতির পত্নী বেগম শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়। বেগম শাহজাহান যথারীতি ধন্যবাদজ্ঞাপক উত্তর প্রেরণ করেন।

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহের পরলোকগমনে ৩০ আষাঢ় ১৩৭৬ তারিখে ৫ ঘটিকায় শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদ্-মন্দিরে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবটি পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারকে প্রেরিত হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ॥

বিগত বার্ষিক সভার দিনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিসপ্ততিতম খণ্ড প্রকাশিত হয় ও উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে বিতরিত হয়। এবৎসর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ও ত্রিসপ্ততিতম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগারের উপকরণাদি-খাতে ১৫০০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পত্রিকা প্রকাশ, পুস্তক প্রকাশ ও কর্মচারী নিয়োগ-খাতে যে বাৎসরিক অর্থসাহায্য দিয়া আসিতেছেন তাহাও যথারীতি পাওয়া গিয়াছে। এজন্য উভয় সরকারকেই পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অবশ্য বলাবাহুল্য যে পরিষদের প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্যের পরিমাণ অত্যন্ত স্বল্প এবং পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ, চিত্রশালা ও গ্রন্থশালার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি কর্মসূচী আর্থিক অসচ্ছলতার কারণেই বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। এবিষয়ে অনন্যোপায় হইয়াই কার্যনির্বাহক সমিতি বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ তারিখের অধিবেশনে সদস্যগণের দেয় চাঁদার হার সামান্য বর্ধিত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষের মধ্যেই বিশেষ সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে। পরিষদের আর্থিক অবস্থা সকল সদস্যের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের উদ্বর্তপত্র আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে গত বৎসরের আয় মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে: ক. চাঁদা, খ. গ্রন্থবিক্রয় ও গ. সরকারী অর্থসাহায্য। এই তিন খাতে ১৩৭৫ সালে যথাক্রমে ৬৬৬৪৲, ৫৪৭৭'৮৯ এবং ৮৫৪০৲ মোট ২০,৬৮১'৮৯ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বলাবাহুল্য যে মাত্র ২০,০০০৲ টাকা আয়ের উপর নির্ভর করিয়া পরিষদের কার্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অতীতের সুলভ সময়ের সঙ্গে বর্তমান কালের মহার্ঘতার কোনো তুলনাই চলে না। বর্তমানে এই আয়ে পরিষদ্ চালান অসম্ভব ইহা বলাই বাহুল্য। কেবলমাত্র বেতনভাতা, ডাক খরচ ও চাঁদা আদায় খরচই প্রায় ২১,০০০৲ টাকা হইয়া থাকে। এই সকল

কারণে প্রতি বৎসর প্রায় ১২।১৩ হাজার টাকার মত ঘাটতি হইতেছে এবং কোনওরূপ বিশেষ কার্য, পুস্তকাদি প্রকাশ, বাঁধাই অথবা ব্যয়সাধ্য কোনও পরিকল্পনার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব হইতেছে। এই বিষয়ের প্রতি সহৃদয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আলোচ্যবর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির পাঁচটি অধিবেশনের মাধ্যমে পরিষদের কার্যাদি পরিচালিত হয়। কর্মাধ্যক্ষগণের নাম পরিশিষ্ট 'খ'-এ উল্লেখিত হইল।

বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের প্রতিনিধি ॥

বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থায় নির্বাচিত সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'গ'-এ প্রদত্ত হইল।

সদস্য সংখ্যা ॥

১৩৭৫ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল।

বান্ধব সদস্য—১, বিশিষ্ট সদস্য—৩, আজীবন সদস্য—৬৩, সাধারণ সদস্য : শহর—৭০৯, মফঃস্বল—৪০।

বান্ধব, বিশিষ্ট ও আজীবন সদস্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ প্রদত্ত হইল।

ভারতকোষ ॥

ভারতকোষ ৪র্থ খণ্ডের মুদ্রণকার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসরে ৪র্থ খণ্ড প্রকাশ সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা আছে। ভারতকোষ প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সাহায্যের আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আলোচ্যবর্ষে জয়ন্তী কার্যসূচী অনুযায়ী ১৪৬ জন ভারতকোষের গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইয়াছেন।

পুথিশালা ॥

পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্যবর্ষে নূতন কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। এ বৎসর মোট ১৬ জন পাঠক-পাঠিকা পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন ও একখানা দেবনাগরী অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুথির (স্বরূপোনিষদ্) ফটো স্ট্যাট কপি করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার ॥

আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থাগারের কাজ যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এই বৎসর গ্রন্থাগার মোট ২৬৭ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৬৯৫১ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬·০৩ জন। গতবৎসরের তুলনায় এ বৎসরে পাঠক সংখ্যা গড়ে দৈনিক ২·৬৪ হারে বর্ধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গড়ে দৈনিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ৫১ জন। ইহা ব্যতীত এবৎসর সদস্য নহেন এমন ১৮৭ জন পাঠককে পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহারা মোট ৪৯৫ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের অনেকেই চেকোশ্লোভাকিয়া, কোরিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশাগত। এই

বর্ধিত পাঠকদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাঠকক্ষের আসন সংখ্যার পরিবর্ধন ও পুনর্বিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। অর্থাভাবে যাহাতে এই অগ্রগতি ব্যাহত না হয় এ বিষয়ে আমরা মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ বৎসর গ্রন্থাগারের লেনদেন পত্রকের সাহায্যে মোট ১৪,৭২৪ খানি পুস্তক আদান-প্রদান হইয়াছে। ইহার মধ্যে লেনদেন বিভাগে ৬,৯৯৫ খানি, পাঠকক্ষে ৭,৭২৯ খানি অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৫৫·৪ খানি পুস্তকের মধ্যে লেনদেন বিভাগে ২৬·২ খানি এবং পাঠকক্ষে ২৯·২ খানি পুস্তক আদান-প্রদান হইয়াছে। গতবছর এই সংখ্যা যথাক্রমে ২২·৭৫ এবং ৩৫·৮৮ ছিল। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'ঙ'-এ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের কর্মীরা পরিষদের অন্যান্য কর্মে ব্যাপৃত থাকায় এ বৎসর গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। ১০,৮৫৮ খানি ইংরেজী পুস্তকের অসমাপ্ত শেল্ফ্ লিস্টের কাজ এ বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ সংগ্রহ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের পঞ্জীকৃত (Indexed) পুস্তক সংখ্যা পরিশিষ্ট 'চ'-এ প্রদত্ত হইল।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্তা কনকলতা দেবী তাঁহার স্বর্গত পুত্র রবীন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য পরিষদে ১০০ (একশত) টাকা দান করিয়াছেন। সে টাকায় পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহাতে 'রবীন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার মাতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে ক্রীত' ছাপ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এ বৎসর যথারীতি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে ও ৬৭৩ খানি পুস্তক (৪,৩৭৫ টাকা) গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থকার, প্রকাশক, সদস্য ও সুধীজন গ্রন্থদানে পরিষদ্-গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এই সহযোগিতার জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশাকরি তাঁহাদের অকুণ্ঠ বদান্যতা পরিষদ্-গ্রন্থাগারকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

পুস্তক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনানুরূপ না হইলেও যথাসাধ্য অগ্রসর হইতেছে। Vacuum fumigation chamber-এ ধূপন-এর কাজ এই বৎসরেই চালু হইয়াছে ও যথারীতি চলিতেছে। আলোচ্যবর্ষে Fumigation chamber-এ ৬৫০ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছে। শ্রীতুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই fumigation-এর ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ১০৲ (দশ) টাকা হিসাবে ৬০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং পরিষদ্-প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা মুদ্রণের জন্য ৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা ব্যতীত এ বৎসর পরিষদের নিজস্ব Hand Lamination Unit গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কয়েকখানা প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থের Lamination-কার্য অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ পুস্তক ক্রয়, বাঁধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। গ্রন্থাগারে অবিরত ব্যবহারের ফলে ছিন্ন গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য জীর্ণ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার Microfilm করা আশু প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের শিক্ষাদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অধুনালুপ্ত 'শম্ভুনাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার' ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কিছু গ্রন্থ পরিষদ-গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ দানের প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। অচিরেই এসকল সংগ্রহ পরিষদ-গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

চিত্রশালা ॥

চিত্রশালায় সংরক্ষিত প্রখ্যাত লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌গণের পত্র, পাণ্ডুলিপি এবং নানা সংগৃহীত ভাস্কর্যাদি বিধিবদ্ধভাবে পঞ্জীকরণের কার্যসূচী বর্তমান বৎসরে আরম্ভ করা হইয়াছে। টেরাকোটা ভাস্কর্যগুলি সুসংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সাহিত্য-সেবীদের পরিচ্ছদ ও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রীগুলি সংরক্ষণের কার্যও রূপায়িত হইয়াছে। পরিষদ্‌ভবনে রক্ষিত প্রথিতযশা সাহিত্য-সেবীগণের চিত্র ও চিত্রসংগ্রহ পুনর্বার বিভিন্ন কক্ষের শোভাবর্ধন করিতেছে।

পুস্তক প্রকাশ ॥

আর্থিক অনটন পুস্তক প্রকাশের কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বর্ধিত হারে নিয়মিত সাহায্য চাহিয়া আমরা যে আবেদন করিয়াছি তাহাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমরা ঝাড়গ্রাম এবং লালগোলা প্রভৃতি বিবিধ তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া এতকাল গ্রন্থাবলী মুদ্রণের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। বর্তমানে পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার এত অধিক হইয়াছে যে পুস্তক প্রকাশ ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক প্রকাশের জন্য বিশেষ তহবিল যাহাতে গড়িয়া তোলা যায় তাহার জন্য সদস্যগণ এবং বঙ্গভাষার সেবকগণের নিকট আবেদন করিতেছি।

বহু বৎসর যাবৎ ক্রমাগত শতকরা ৫% হারে ক্ষয়ক্ষতি ধরায় পরিষদ্‌ ভবনের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে কমিয়া যাওয়ায় (পরিষদ্‌-ভবন ২,৮২৯'৫৭ এবং রমেশভবন ৯'৩৫৯'৯৪ টাকা =মোট ১২,১৮৯'৫১) কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে হরিশ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং-এর শ্রীএইচ. সি. মুখার্জী মহাশয় বিগত ১৭ আষাঢ় ১৩৭৫ তারিখে পরিষদ-ভবন পরিদর্শন করিয়া পুনর্মূল্যায়ণ সম্পর্কিত যে রিপোর্ট দাখিল করেন তদনুসারে আলোচ্যবর্ষের উদ্বর্তপত্রে পরিষদ-ভবনের মূল্য বর্ধিত করা হইয়াছে। পরিষদ্‌-ভবনের ন্যায় একটি বৃহৎ অট্টালিকার পুনর্মূল্যায়ণের এই ব্যয়-সাধ্য কাজটি শ্রীএইচ. সি. মুখার্জী বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দেওয়ায় পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারের পুনর্মূল্যায়ণও করা হইয়াছে। তাঁহাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রচার ॥

এই বৎসর পরিষদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিষদের প্রকাশিত ভারতকোষ ও অন্যান্য গ্রন্থ, পরিষদে অনুষ্ঠিত নানা উৎসব, প্রদর্শনী

ও সভা-সমিতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন বহুল প্রচারিত দৈনিক ও সাময়িকপত্রে বিজ্ঞপ্তি, বিবরণ ও বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশ করা হইয়াছে। আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে তাঁহাদের সংবাদ-বিচিত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য-পরিষদ্ সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান প্রচারিত হইয়াছিল, পরিষদের পক্ষ হইতে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন পরিষদ্ সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সহকারী সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদ সম্পাদক এবং পরিষদ্-কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

সকল সদস্যের আগ্রহে এবং বর্তমান বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতির আনুকূল্যে পরিষদকে দ্বিতীয় বৎসর সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। মাননীয় সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে যে অকৃত্রিম উৎসাহ ও সস্নেহ উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কার্যনির্বাহক সমিতির সকল সভ্য এবং শাখা ও উপসমিতির সভ্যগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বলা বাহুল্য যে, পরিষদের প্রতিটি কর্মীর একান্ত সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রতি কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সর্বশেষে পরিষদের সহকারী সম্পাদকদ্বয় শ্রীদেবজ্যোতি দাশ ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল এবং আয়-ব্যয় উপসমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কার্য-পরিচালনায় আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট একান্তভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বস্তুতঃ এই চারজন সহকর্মী ব্যতীত পরিষদের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব হইত। ইহা সত্ত্বেও পরিষদের সেবায় সম্ভবতঃ অনেক ত্রুটি হইয়াছে। এই ত্রুটির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আশাকরি সকল সদস্যের সহযোগিতায় পরিষদের কার্য আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগ পাইব।

পরিশিষ্ট 'ক'

৭৫তম বর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভার কার্যসূচী

১৪ চৈত্র, ১৩৭৫

(২৮ মার্চ, ১৯৬৯)

সময়—সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা

প্রদর্শনী-উদ্বোধন

সভাপতি : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রধান অতিথি : শ্রীনরেন্দ্র দেব

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধক : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

টেরাকোটা প্রদর্শনীর উদ্বোধক : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

১৫ চৈত্র, ১৩৭৫

(২৯ মার্চ, ১৯৬৯)

সময়—অপরাহ্ন ৫-৩০ ঘটিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানশিক্ষা

সভাপতি : শ্রীপরিমলবিকাশ সেন

বক্তৃতার বিষয় : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

বক্তা : শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুহৃদ্‌চন্দ্র সিংহ

১৬ চৈত্র, ১৩৭৫

(৩০ মার্চ, ১৯৬৯)

সময়—অপরাহ্ন ৫৩-০ ঘটিকা

বাংলা সাহিত্য : প্রথম পর্ব

সভাপতি : শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

উদ্বোধক : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তৃতার বিষয় : বাংলা কবিতা

বক্তা : শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বক্তৃতার বিষয় : বাংলা কথাসাহিত্য

বক্তা : শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৭ চৈত্র, ১৩৭৫

(৩১ মার্চ, ১৯৬৯)

সময়—সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা

বাংলা সাহিত্য : দ্বিতীয় পর্ব

সভাপতি : শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

বক্তৃতার বিষয় : বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য

বক্তা : শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তৃতার বিষয় : বাংলার লোকশিল্প

বক্তা : শ্রীপ্রভাস সেন

বক্তৃতার বিষয় : বাংলার সংগীত

বক্তা : শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

পরিশিষ্ট 'খ'

পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণের নাম

সভাপতি ॥ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সহকারী সভাপতি ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক ॥ শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সহকারী সম্পাদক ॥ শ্রীদেবজ্যোতি দাশ ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কোষাধ্যক্ষ ॥ শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ

পত্রিকাধ্যক্ষ ॥ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

পুথিশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীউষা সেন

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ॥ সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, দিলীপকুমার বিশ্বাস, মনোমোহন ঘোষ, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী দত্ত, ত্রিদিবনাথ রায়, লীলামোহন সিংহরায়, অজয় হোম, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত, আইভি রাহা, দেবকুমার বসু।

শাখা-পরিষদের পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ॥

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন—নৈহাটি শাখা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—গৌহাটি শাখা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—মেদিনীপুর শাখা

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ—বিষ্ণুপুর শাখা

শ্রীবিপ্লবকুমার দাস—কলিকাতা পৌরপ্রতিনিধি।

পরিশিষ্ট 'গ'

বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :

ক. বিদ্যাসাগর লেকচারারশিপ স্পেশাল কমিটি ॥ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

খ. কমলা লেকচারারশিপ স্পেশাল কমিটি ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

এশিয়াটিক সোসাইটির 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী প্লেক' উপদেষ্টা কমিটি ॥ শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

পরিশিষ্ট 'ঘ'

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

বিশিষ্ট সদস্য : সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজীবন সদস্য : সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, লীলামোহন সিংহরায়, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ইন্দ্রভূষণ বিদ, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নির্মলকুমার বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভূভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেশচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, ঊষা সেন, রণজিৎকুমার দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বসু, বলাইচাঁদ কুণ্ডু, সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখার্জি, গিরীন্দ্রমোহন সাহা, অমিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল।

পরিশিষ্ট 'ঙ'

বিষয়ানুযায়ী ঃ

বিষয়	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	১০১	৬০	১৬১
ধর্ম (২০০)	২৪০	২০৮	৪৪৮
সমাজবিজ্ঞান (৩০০)	১১০	১৫১	২৬১
শিক্ষা (৩৭০)	১৮	১০৫	১২৩
ভাষাতত্ত্ব (৪০০)	৪৩	১৭৮	২২১
বিজ্ঞান (৫০০)	২৯	৯	৩৮
ব্যবহারিক (যন্ত্র) বিজ্ঞান (৬০০)	২১	৫	২৬
শিল্পকলা (৭০০)	৫৪	৬৫	১১৯
সঙ্গীত (৭৮০)	৬৫	১২৮	১৯৩
সাহিত্য (৮০০)	৫,২৬৯	২,৬৫১	৭,৯২০
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১৭১	৬৩	২৩৪
জীবনী (৯২০)	৬৩৩	৪৫৬	১,০৮৯
ইতিহাস (৯০০,৯৩০-৯৯৯)	১৭৫	৩২০	৪৯৫
সহায়ক গ্রন্থ (reference books)	৬৬	২৩৪	৩০০
পত্র-পত্রিকা		৩,১৬৬	৩,১৬৬
মোট	৬,৯৯৫	৭,৭৯৯	১৪,৭৯৪

ভাষানুযায়ী ঃ

বাংলা	৬,৭৫৫	৭,০৫২	১৩,৮০৭
ইংরেজী	২১৬	৭২০	৯৩৬
সংস্কৃত	২৪	২৭	৫১
মোট	৬,৯৯৫	৭,৭৯৯	১৪,৭৯৪

পরিশিষ্ট 'চ'

ব্যক্তিগত সংগ্রহ

বিদ্যাসাগর	৩,২৭৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	১,০৯৫
রামেন্দ্রসুন্দর	১,৭৭৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২,২০৩
ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৯৫
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৫২৮
বিনয়কৃষ্ণ দেব	৫৭৮
যতীন্দ্রনাথ পাল	৯,২২৫
	১৯,৬৭০

সাধারণ সংগ্রহ

বাংলা	১৮,১১০
সংস্কৃত	১,৪৮৬
ইংরেজী	১০,৮৪৮
হিন্দী	১২
অসমীয়া	১৪৭
অন্যান্য	
সাময়িকপত্র :	
ইংরেজী	১,৪৮৩
বাংলা	৯৩১
	৫২,৬৯২
ছাপানো তালিকা	১৩,৫৪৭
সর্বমোট	৬৬,২৩৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্

৭৬তম বার্ষিক কার্যবিবরণ

●

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্

॥ ষট্‌সপ্ততিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠসপ্ততিতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৬তম বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থিত করিতেছি। সূচনায় বিগত বৎসরের পরলোকগত সাহিত্য-সাধকদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পরিষদের অন্যতম সুহৃদ্ ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর ১ ভাদ্র ১৩৭৬ তারিখে, চিত্রশিল্পী ও কবি সতীন্দ্রনাথ লাহা বিগত ৫ ভাদ্র তারিখে, প্রখ্যাত বৈষ্ণব-সাহিত্যিক বিমানবিহারী মজুমদার ২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ তারিখে এবং প্রথিতযশা সাহিত্য-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ ফাল্গুন ১৩৭৬ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন; তাঁহাদের মৃত্যুতে বঙ্গদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে এবং পরিষৎ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন।

পরিষদের অন্যতম হিসাব-পরীক্ষক ও সদস্য সরলকুমার চট্টোপাধ্যায় অকস্মাৎ পরলোকগমন করায় পরিষদের হিসাব পরীক্ষার কার্য বহুকাল বিলম্বিত হয়। কলিকাতার আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি হিসাব পরীক্ষার কার্যকে প্রলম্বিত করিয়াছে। মূলত এই দুই কারণে বাৎসরিক সভার আয়োজন করিতে যে দেরি হইয়াছে তাহার জন্য সভ্যগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আর্থিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই। কেবলমাত্র আজীবন সদস্য ও মফঃস্বল সদস্যগণের চাঁদার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। তাহার ফলে পরিষদের কোষাগারে অর্থের অনটন স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতকোষের পঞ্চম খণ্ডের জন্য সরকারী সাহায্য আসার বিলম্ব ঘটায় অসুবিধা চরম হইয়াছে। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের উদ্বর্তপত্র আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে এই বৎসরের আয়কে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন খাতে অর্থাৎ (ক) চাঁদা আদায় (খ) গ্রন্থ বিক্রয় (ভারতকোষ বিক্রয় ৩,৭২০·০০ বাদে) ও (গ) সরকারী অর্থসাহায্য বাবদ আয় যথাক্রমে ৭,৪১৩·০০, ৪,২৫৬·৬৭ ও ৮,৫৪০·০০ মোট ২০,২০৯·৬৭ টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র বেতন ও ভাতা বাবদ পরিষদের ব্যয় ২০,৯৩৩·৮১ টাকা মাত্র; সুতরাং এই অবস্থা হইতে কালবিলম্ব না করিয়া মুক্ত হওয়া আবশ্যক। সভ্য মহাশয়গণের সাহায্য ভিন্ন পরিষদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি করা যাইবে না এবং মাসিক চাঁদার সামান্য বৃদ্ধি মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করিবে। এ-বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কার্যনির্বাহক সমিতি ॥

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির ৭টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। (৭৬তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লেখিত হইল)।

সদস্য ॥

বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ'-এ প্রদত্ত হইল।

সভাসমিতি ॥

বর্তমান বর্ষে এগারোটি সভাসমিতির ব্যবস্থা করা হয়। তন্মধ্যে এই বৎসরের বিশেষ অনুষ্ঠান পটচিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে আলোচনা সভা দুটি জ্ঞানী ও গুণীজন কর্তৃক বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। পাঁচটি আলোচনা সভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদে নিম্নলিখিত সভাসমিতিগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশেষ আলোচনা সভা : (১৩ ভাদ্র ১৩৭৬)

উদ্বোধক : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাপতি : শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (উপস্থিত হইতে পারেন নাই)।

আলোচ্য বিষয় : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিঃসঙ্গতা'।

বক্তা : শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ।

এই আলোচনা সভায় আধুনিক যুগের সাহিত্যিকগণ বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

প্রথম মাসিক অধিবেশন : (২১ ভাদ্র ১৩৭৬)

সভাপতি : শ্রীসুকুমার সেন।

আলোচ্য বিষয় : 'হুতোম পেঁচার নকশা।'

বক্তা : শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

এ সভায় বক্তা প্রামাণ্য তথ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে 'হুতোম পেঁচার নকশা'র আসল রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ নহেন। সভাপতি মহাশয় বক্তার উক্তি সমর্থন করেন।

বিশেষ আলোচনা সভা : (১০ আশ্বিন ১৩৭৬)

সভাপতি : শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

উদ্বোধক : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বিষয় : 'রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী।'

বক্তা : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

সমসাময়িক কালে ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী রাজা রামমোহন রায়কে কিরূপ অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এই সভায় সে বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা হয়।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন : (১৭ আশ্বিন ১৩৭৬)

সভাপতি : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বিষয় : 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রয়োজনীয়তা।'

বক্তা : শ্রীকুমারেশ ঘোষ।

অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তথ্যপূর্ণ হওয়ায় উপস্থিত ভাষণটি সকলের প্রশংসা লাভ করে।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন : (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬)

সভাপতি : শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধক : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বিষয় : 'উপন্যাসে আঞ্চলিকতা।'

বক্তা : শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

এই আলোচনা সভায় বক্তা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আঞ্চলিকতাও আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজিকার আলোচনা যদি তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে তিনি কখনই আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা ত্যাগ করিতেন না। বক্তার উদ্ধৃতিবহুল আলোচনা অত্যন্ত মনোগ্রাহী হইয়াছিল।

প্রীতি সম্মিলনী : (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬)

সভাপতি : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্তমানে প্রীতি সম্মিলনের রেওয়াজ অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু ইহার সামাজিক মূল্য যে অপরিসীম সে সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

বিশেষ সাধারণ সভা : (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬)

সভাপতি : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বিষয় : 'পরিষদের সদস্য-চাঁদা বৃদ্ধির প্রস্তাব।'

এই সভায় মাসিক চাঁদা বৃদ্ধির প্রস্তাবও করা হয়। আজীবন সদস্যের চাঁদা ২৫০.০০ হইতে ৩৫০.০০ করার প্রস্তাব এই সভায় পাশ হয়। মফঃস্বল সদস্যগণের চাঁদা বার্ষিক ৬ টাকার স্থলে ১০ টাকা অনুমোদিত হয়।

শোক সভা : (২৫ মাঘ ১৩৭৬)

সভাপতি : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বক্তা : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় প্রমুখ।

ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বঙ্গসাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একান্ত সুহৃদ্ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের পরলোকগমনে এই শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরম বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ডঃ মজুমদারের বিবিধ গবেষণাকর্ম এবং জীবন-চরিত সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। পরিষদের সুহৃদরূপে ডঃ মজুমদার আমরণ কাজ করিয়া গিয়াছেণ—স্মৃতিতর্পন প্রসঙ্গে একথা সকলেই স্মরণ করেন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন : (২৫ চৈত্র ১৩৭৬) :

সভাপতি : শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয় : ভোট পরীক্ষক নির্বাচন

এই সভায় ভোট পরীক্ষক নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা হয়।

পটচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভা : (৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭)

সভাপতি : শ্রীকরুণাকেতন সেন

প্রধান অতিথি : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

পটচিত্র সম্বন্ধে আলোচনা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুহৃদ্ ভৌমিক, শ্রীতারাপদ সাঁতরা প্রমুখ।

পটচিত্র প্রদর্শন : শ্রীবীরেন চিত্রকর, শ্রীমতিলাল চিত্রকর ও শ্রীপঞ্চানন চিত্রকর।

পটচিত্র বিষয়ে আলোচনা সভা (১২ আষাঢ় ১৩৭৭) :

উদ্বোধক : শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

সভাপতি (প্রথম অধিবেশন) : শ্রীসুরজিৎ সিংহ

সভাপতি (দ্বিতীয় অধিবেশন) : শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীমতী গীতিকা গুহ, শ্রীতারাপদ সাঁতরা, ডেভিড ম্যাক্‌কাট্চন, শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায় প্রমুখ।

দুইটি অধিবেশনে বিভক্ত এই আলোচনা সভাটি খুবই মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

পুস্তক প্রকাশ

বর্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

১. ব্যোমকেশ মুস্তফী (সা. সা. চ.—১০৩)—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সা. সা. চ.—১০৪)—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

৩. সজনীকান্ত দাস (সা. সা. চ.—১০৫)—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ও বর্তমানে নিঃশেষিত ১৩খানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পুনর্মুদ্রণার্থে আনুমানিক ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে মোট ২৪,৭৫৮·০০ কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থানুকূল্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশ ও মুদ্রণের কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৭০তম ও ৭৪তম খণ্ড দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতকোষ

কার্যনির্বাহক সমিতি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, চতুর্থ খণ্ডে ভারতকোষ সম্পূর্ণ করিতে হইলে যে সময় ও অর্থসম্বল প্রয়োজন তাহা পরিষদের নাই; সুতরাং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত করা হউক এবং পাঁচ খণ্ডে ভারতকোষ সম্পূর্ণ করা হউক। তদনুযায়ী আলোচ্য বর্ষে 'ভারতকোষ' চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের কার্য অগ্রসর হইতেছে। চতুর্থ খণ্ডে 'দ—ফ' পর্যন্ত শব্দ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

চিত্রশালা

গত বৎসরে প্রখ্যাত লেখক, বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্গণের পত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি পঞ্জীকরণের যে কাজ শুরু হইয়াছিল বর্তমান বৎসরে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। ভাস্কর্য, চিত্র প্রভৃতির পঞ্জীকরণের কাজ যথাবিহিত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। আগামী বৎসরে উহা সমাপ্ত হইবে আশা করা যায়। বর্তমান বর্ষে চিত্রশালার প্রদর্শন-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। নূতন কিছু আসবাবপত্রও প্রস্তুত করা হইয়াছে।

চিত্রশালায় ২১ দিন ব্যাপী পটচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। প্রদর্শনী উপলক্ষে পট ও পটুয়াগণ সম্পর্কে একটি

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২১ জন বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনা হয়।

চিত্রশালায় রক্ষিত দলিলপত্র, চিঠি প্রভৃতি বর্তমান বর্ষ হইতে গবেষকগণকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে।

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থশালার কার্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এই বৎসর গ্রন্থশালা মোট ২৭৫ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৮৬২৪ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩১.৩ জন) পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লেনদেন বিভাগে ৪৬২২ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬.৮ জন) এবং পাঠকক্ষে ৪০০২ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৪.৫ জন) উপস্থিত ছিলেন। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর পাঠক-সংখ্যা গড়ে দৈনিক ৪.২৭ হারে বর্ধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দৈনিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ৫৬ জন। ইহা ব্যতীত এবৎসর সদস্য নহেন এমন ১৩৭ জন ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহারা মোট ২১৪ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন।

এই বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৬৭৯২ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬১.০৬ খানি) পুস্তকের আদান প্রদান হইয়াছে। ইহার মধ্যে লেনদেন পত্রকের সাহায্যে ৭৭০৫ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৮.০১ খানি) ও পাঠকক্ষে ৯০৮৭ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৩.০৫ খানি) পুস্তকের আদান প্রদান হয়। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান প্রদানের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মোহনবাগান লেন নিবাসী সর্বশ্রী বৃন্দাবন সেন, মথুরানাথ সেন গোপালচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ সেন ও কৃষ্ণচন্দ্র সেন তাঁহাদের পিতার স্মৃতিতে স্থাপিত শম্ভুনাথ স্মৃতি গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ পুস্তক-সংগ্রহ, প্রায় ২,০০০ পুস্তক পরিষদ্-গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। তাঁহাদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নব-ব্যারাকপুরের মেন রোড (ওয়েস্ট) নিবাসী শ্রীমতী আশারাণী পাল পরিষদ্-গ্রন্থাগারে ৯০২ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ দান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত এ বৎসর যথারীতি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে; উপহার-স্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট হইতে ১৫৯১ খানি পুস্তক (মূল্য প্রায় ৫,০০০.০০ টাকা) পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থাদি দানে পরিষদ্-গ্রন্থশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের কর্মীরা পরিষদের অন্যান্য কর্মে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এ বৎসর এই বিভাগের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সাধারণ সংগ্রহ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের পঞ্জীকৃত (Indexed) পুস্তক সংখ্যা পরিশিষ্ট 'ঙ'-এ দেওয়া হইল।

গ্রন্থাশালার পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও আলোচ্য বর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। ধূপন-প্রকোষ্ঠে (Fumigation Chamber) এবৎসর ৪৯৯ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছে, উইপোকার উপদ্রব দূরীকরণের ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পাঠকক্ষের আসন বৃদ্ধি আশু প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু প্রাচীন ও জীর্ণ পুথি ও পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিল্ম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থাভাববশতঃ বাঁধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার পাঠকক্ষ ও চিত্রশালার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এককালীন ও নিয়মিত অনুদানের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের বিশেষ অনুষ্ঠান

বর্তমান বৎসরে পরিষদ্-মন্দিরে ২১ দিন ব্যাপী একটি পটচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে ৪৫টি পটচিত্র প্রদর্শিত হয়। পটগুলির মধ্যে মাত্র ২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালার। বাকি ৪৩ খানি পট সংগ্রহ করা হইয়াছিল বিভিন্ন সূত্র হইতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালা, আশুতোষ মিউজিয়াম, আনন্দনিকেতন কৃষ্টিশালা প্রভৃতি সংস্থা এবং শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীডেভিড ম্যাক্‌কাট্‌চন, পণ্ডিত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, শ্রীসুধাংশু কুমার রায় এবং শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে। পটচিত্রগুলি অনুগ্রহ করিয়া দিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করা হয় ৩১ জ্যৈষ্ঠ। অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল পটুয়া-সংগীত। মেদিনীপুর জেলার আমদাবাদ গ্রামের ৩ জন পটুয়া পট খেলাইয়া পটুয়া-সংগীত গান করেন। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে পটগুলির বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মতো। পটগুলির মধ্যে ছিল পৌরাণিক, সামাজিক, গান্ধী এবং সাঁওতালী পট। এইরূপ বৈচিত্র্যময় পট-প্রদর্শনী সাম্প্রতিক কালে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই।

প্রদর্শনী উপলক্ষে পরিষদ্-মন্দিরে ২৭ জুন 'পট ও পটুয়া' এই বিষয়ে একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনা-চক্রটিকে দুইটি অধিবেশনে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল পটুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক আলোচনা। এই অধিবেশনে ১১ জন বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং প্রবন্ধগুলির উপরে আলোচনায় যোগদান করেন ২০ জন। দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল পটশিল্প। এই অধিবেশনে ৮ জন বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হয়। এই আলোচনায় যোগদান করেন ১৮ জন। এই আলোচনা-সভায় যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহাদের অধিকাংশই বাংলা দেশের পটুয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণ করিয়া প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। এই বিষয়ে এতগুলি বিশেষজ্ঞের সমাবেশ আলোচনা-সভাটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলোচনা-চক্রে যে সমস্ত প্রবন্ধ উপস্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিকে একত্র করিয়া একটি সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পুথিশালা

পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্য বর্ষে নূতন কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে মোট ১৩ জন পাঠক-পাঠিকা পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

এককালীন দান

আলোচ্য বর্ষে ভারতকোষ তহবিলের জন্য শ্রীনির্মলকুমার বসু পরিষদ্‌কে মোট ৩,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

উপসংহার

সকল সদস্যের আগ্রহে এবং বর্তমান বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতির আনুকূল্যে পরিষদকে তৃতীয় বৎসর সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। মাননীয় সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে যে অকৃত্রিম উৎসাহ ও সস্নেহ উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কার্যনির্বাহক সমিতির সকল সভ্য এবং শাখা ও উপসমিতির সভ্যগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বলা বাহুল্য যে পরিষদের প্রতিটি কর্মীর একান্ত সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রতি কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল এবং আয়-ব্যয় উপসমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কার্য-পরিচালনায়

আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট একান্তভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বস্তুতঃ এই কয়জন সহকর্মী ব্যতীত পরিষদের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব হইত। ইহা সত্ত্বেও পরিষদের সেবায় সম্ভবতঃ অনেক ত্রুটি হইয়াছে। এই ত্রুটির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আশাকরি সকল সদস্যের সহযোগিতায় পরিষদের কার্য আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

ষট্‌সপ্ততিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম

সভাপতি ॥ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী সভাপতি ॥ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

সম্পাদক ॥ শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

সহকারী সম্পাদক ॥ শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

কোষাধ্যক্ষ ॥ শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ।

পত্রিকাধ্যক্ষ ॥ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য।

পুথিশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

চিত্রশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীমতী উষা সেন।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ॥

সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, দিলীপকুমার বিশ্বাস, মনোমোহন ঘোষ, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, কল্যাণী দত্ত, ত্রিদিবনাথ রায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, লীলামোহন সিংহরায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, অজয় হোম, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, নির্মল সিংহ, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত, পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শেফালী দত্ত।

শাখা-পরিষদের পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ॥

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন—নৈহাটি শাখা
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য - গৌহাটি শাখা
শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—মেদিনীপুর শাখা
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ—বিষ্ণুপুর শাখা
শ্রীতপন গঙ্গোপাধ্যায়—কলিকাতা পৌরপ্রতিনিধি।

পরিশিষ্ট 'খ'

১৩৭৬ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য ঃ

বান্ধব ঃ রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট সদস্য ঃ সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ।

আজীবন সদস্য ঃ সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, লীলামোহন সিংহরায়, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ইন্দ্রভূষণ বিদ, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নির্মলকুমার বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভুভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রণজিৎকুমার দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বসু, বলাইচাঁদ কুণ্ডু, সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়,

কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখার্জি, গিরীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, অরুণকুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বসু, অতীশচন্দ্র সিংহ, দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, মধুসূদন মজুমদার।

সাধারণ সদস্য সংখ্যা : ৯৪১ জন

মফঃস্বল সদস্য সংখ্যা : ২৮ জন

পরিশিষ্ট 'গ'

বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের প্রতিনিধি

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশন—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়াটিক সোসাইটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী
প্লাক অ্যাডভাইসরি বোর্ড—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসরোজিনী বসু
স্বর্ণপদক কমিটি—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা প্রাইজ
স্পেশাল কমিটি—শ্রীকল্যাণী দত্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র
লেক্চারশিপ কমিটি—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

কলিকাতা কিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী
স্বর্ণপদক কমিটি—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও
সংগ্রহশালা ম্যানেজিং কমিটি—শ্রীমতিলাল কুণ্ডু

পরিশিষ্ট 'ঘ'

বিষয়ানুযায়ী :

বিষয়	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	১১৫	১৩৮	২৫৩
ধর্ম (২০০)	২৩৩	২৬১	৪৯৪
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	১২৩	১৭৬	২৯৯
শিক্ষা (৩৭০)	২৯	১১৪	১৪৩
ভাষা (৪০০)	৬২	৮৬	১৪৮
বিজ্ঞান (৫০০)	১৭	২১	৩৮
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০)	১০	১৪	২৪
শিল্পকলা (৭০০)	৬৫	৯৬	১৬১
সঙ্গীত (৭৮০)	৬৫	৪৪	১০৯
সাহিত্য (৮০০)	৬০২৩	২,৩২৭	৮,৩৫০
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১৯৪	১০৯	৩০৩
জীবনী (৯২০)	৪৭৩	৪১৩	৮৮৬
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১৯৪	৩৭১	
সহায়ক গ্রন্থ (reference books)	১০২	২৭৪	৩৭৬
পত্র-পত্রিকা		৪,৬৪৩	৪,৬৪৩
	৭,৭০৫	৯,০৮৭	১,৬৭৯২

ভাষানুযায়ী :

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৭৫৭৬	৮২২৩	১৫৭৮৯
ইংরেজী	১১৮	৭৮৮	৯০৬
সংস্কৃত	২০	৭৬	৯৬
হিন্দী	১		১
	৭৭০৫	৯০৮৭	১৬৭৯২

পরিশিষ্ট 'ঙ'

সাধারণ সংগ্রহ

বাংলা	১৮,৮৫০
ইংরেজী	১০,৯২৯
সংস্কৃত	১৪,৯০
হিন্দী, অসমীয়া, মারাঠী ইত্যাদি	১৬৪

সাময়িকপত্র

ইংরেজী	১,৪৮৩
বাংলা	২,০০২

ব্যক্তিগত সংগ্রহ

বিদ্যাসাগর	৩,২৭৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	১,০৯৫
রামেন্দ্রসুন্দর	১,৭৭৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২,২০৩
ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৯৫
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫২৮
বিনয়কৃষ্ণ দেব	৫৭৮
যতীন্দ্রনাথ পাল	৯,৫৪৫
	৫৪,৯০৮
ছাপানো তালিকা :	১৩,৫৪৭
	৬৮,৪৫৫